দিন নেই রাত নেই

সুপ্রিয় রাহা

সূর্য প্রকাশনী
৩০ বিধান সরণি

প্রকাশক
সূর্য প্রকাশনী

প্রথম প্রকাশ
দোল পূর্ণিমা ১৩৭০

প্রচ্ছদ সজ্জা
সুপ্রিয় রাহা

মুদ্রক
তাপসী প্রেস
৩০ বিধান সরণি
কলিকাতা

উৎসর্গ

অগ্রজ মাখনলাল রাহা

অনুজ রণজিত ও সত্যজিত রাহাকে

এখানকার লাল কাঁকুরে মাটিতে একদিন ছিল শুধু নিশ্চুপ প্রতীক্ষার অন্তহীন জপমন্ত্র। ছোট ছোট চড়াই-উৎরাই বেয়ে ঢেউ খেলানো শালের বনে চৈত্র-শেষের ঝড় দুরন্ত আবেগে ছুটে এসে ঝুটি ধরে নাচানাচি করতো, আগুন-ঝরা রৌদ্রদিনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পুড়তো বন-বনান্তর, বর্ষার সজল কালো মেঘ মাথার উপর এসে থমকে দাঁড়ালে শান্তি পেতো, চোখ তৃষিত হতো। আর রাত্রির অনন্ত উন্মুখ নক্ষত্র জ্বলা আকাশের সামিয়ানার নিচে, শ্রান্ত বনরাজি নিস্তব্ধ প্রহর গুণতো। কবে! কবে সে দিন আসবে! এই অন্তহীন প্রতীক্ষার শেষ হবে কবে?

তার পর একদিন বিবর্ণ ধূসর প্রান্তর আর শালের স্তব্ধতাকে বিদীর্ণ করে ক্লান্তিহীন রূপালী আভার দুটি তির্যক লৌহরেখা ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে ছুটে শূন্য বিন্দুতে এসে মিশে যেতেই, মানুষের লোভী চোখ উৎফুল্ল হয়ে উঠেছে, কোলাহল আর ব্যস্ততার সঙ্গে ভিড় করে এসেছে। সেই ভিড় একটু একটু করে একদিন জনপদ হয়ে উঠেছে এখানে।

রেল স্টেশন ঘিরে, আশে পাশে শহর গড়ে উঠেছে আজ নয় অনেক দিন। দিনের পর দিন একটু একটু করেই গড়ে উঠেছে। অথচ বছর কয়েক আগেও লোভাতুর মানুষের চোখকে ফাঁকি দিয়ে, রেলইয়ার্ডের পাশের মাঠটা, গাছ-গাছালির ফাঁকে ফাঁকে আর আকাশের দিকে চেয়ে চেয়ে ফাঁকাই পড়েছিল। ফাঁকা পড়েছিল কারণ মাঠটা ছিল রেল-কোম্পানীর, তার সর্বাঙ্গে ছিল কোম্পানীর অলিখিত সীমাচিহ্ন।

মাঠের দক্ষিণ দিকে ছোট-বড় সারি সারি কোয়ার্টার্স। উত্তরে রেলওয়ে ইয়ার্ড ও মাল-গুদামের সার। উঁচু আর শক্ত পাঁচিল গেঁথে মাঠটাকে ইয়ার্ড থেকে সম্পূর্ণ পৃথকই করে রেখেছে রেল-কোম্পানী। পূব দিক দিয়ে যেন দৌড়েই চলে গেছে প্রশস্ত পিচের রাস্তা। রাস্তাটা ষ্টেশন থেকে বেরিয়ে একেবারে মাঠের চোখের উপর দিয়েই শহরের প্রাণকেন্দ্র বাজারের ভেতর গিয়ে থেমেছে। সারাদিন এই পথে গাড়িঘোড়া, লোক-চলাচলের অন্তহীন মিছিল স্রোতের মত গড়িয়ে গড়িয়ে চলে।

আর পশ্চিমে, এই রাস্তায় দাঁড়িয়ে চোখ তুলে চাইলে আন্দাজ করা যায় পেছনে অনেকদূর পর্যন্ত বেশ আঁটো সাটো ভাবে ভীড় করে আছে হিজল, বাবলা, ছাতিম ও শিমূল, আছে ভাঁটি বনতুলসী ও বনশিউলির ঝাড়। তার পরই ছোট একফালি নদী যেন অন্য মনস্কের মতই সারা বছর তির তির করে বয়ে যায়। শুধু একবার, বছরে একটিবার মাত্র তার বুকে পূর্ণযৌবনা নারীর উদ্বেল আবেগের ঢল নামে। তখন বর্ষাকাল। নদীটির অন্যমনস্কতা সেই সময় স্বাস্থ্য আর শক্তির দীপ্তিতে সরব হয়ে ওঠে।

বোধ করি জায়গাটা নিয়ে রেল-কোম্পানীর প্রয়োজনের চোখ এখনও উৎসাহিত হয়ে ওঠেনি। তাই নিরুপদ্রবে, নির্বিঘ্নে দিন কাটে, মাস আসে, বছর ঘোরে। চারি পাশের মানুষজন, গাড়ী-ঘোড়া, কলকোলাহলের ভেতরও জায়গাটা কেমন নিশ্চুপ, নিঝুম। বহুকালের পুরানো বট অশ্বত্থ শিমূল আর কৃষ্ণচূড়ার পত্রচ্ছায়ায় সূর্যের সরাসবি প্রবেশ ঘটে না এখানে। যেটুকু আসে, সে শুধু পত্রান্তরালের আড়াল আবডাল থেকে নির্জন ছায়াচ্ছন্নতায় উঁকি ঝুঁকি মেরেই সান্ত্বনা পায়। অথচ জায়গাটা স্যাঁত্ সেঁতে নয়। কাঁকুরে মাটিতে রস জমেনা, বৃষ্টির জল গড়িয়ে চলে যায় ঢালু পথ বেয়ে বড় রাস্তার পাশে নর্দমার দিকে।

কিন্তু গাছ-গাছালির ছায়াচ্ছন্ন মমতা, টুকরো টুকরো রোদের

উদ্বেগনিক্ত ক্ষণমুহূর্তের আত্মসমর্পণ, বৃষ্টির জল, নিয়মিত ফুল ফোটা আর ফল ধরার সঙ্গে সঙ্গে মাঠটা যে বে-কসুর খালাস পেয়ে গিয়েছিল তা নয়। কবে, কখন কোথা থেকে এই সর্বরিক্ত ছিন্নমূল মানুষের দল আশ্রয় খুঁজে খুঁজে শেষ পর্যন্ত এই ছায়াছন্নতায় আশ্রয় খুঁজে পেয়েছিল, তা সঠিকভাবে কেউ বলতে পারবে না। এক সঙ্গে এসেছে তা নয়। একজন দুজন করে এসেছে, ধীরে ধীরে আস্তানা গেড়েছে। মাথা গুঁজবার মত ঠাঁই বলতে যা বোঝায় এগুলো বুঝি তাও নয়। যেন প্রাকৃতিক দুর্দৈব আর শারীরিক দুরাবস্থার রক্ত চক্ষুকে উপেক্ষা করতে না পেরে নিরুপায় আত্মার একটা প্রাণান্ত প্রচেষ্টা শুধু একটু আড়াল সৃষ্টি করে মানুষ নামক জীবটি স্বস্তি পেতে চেয়েছে।

অথচ আচ্ছাদন আর আবরণ পোক্ত করে তুলবে তেমন সামর্থ্য নেই, রেল কোম্পানীর দৃষ্টিও সেদিকে তেমন শিথিল নয়। কোম্পানীর ইচ্ছেটা যেন এই, ফাঁকা আছে তাই ফাঁক পেয়েছে। কিন্তু একটা একটা ইট-কাঠ জোগাড় করবে আর তা গেঁথে মৌরসী পাট্টার মতলব করো না। যেমন আছ তেমনি থাক। বাড়াবাড়ি চলবে না।

বাড়াবাড়ি ওরা কেউ করে না; করবার মুরোদই বা কোথায়? প্রতিনিয়ত তারা ভয়ে ভয়ে থাকে; কখন বুঝি শমন এসে যায়। এখানে নিশ্চিন্ততা নেই সত্য কিন্তু জীবনযাত্রায় বুঝি এখন খানিকটা স্বাভাবিকতা এসে গিয়েছে একটু একটু করে। আবার একটা অনির্দিষ্ট আশ্রয়ের সন্ধানে বেরুতে হবে শুনলে কারোই ভাল লাগে না। তাই যেন শুধু একটু আড়াল সৃষ্টি করেই ওরা রেল-কোম্পানীর চোখের আড়াল হবার প্রাণান্ত তপস্যা করে যায় দিনের পর দিন।

—বেটাচ্ছেলেরা যে এখানে ঘর-সংসার পাকিয়ে বসল হে!

—তাই তো দেখছি। এই তো সেদিনও খালি খালি ছিল মাঠটা।

—পৃথিবীর সর্বত্র ভিখারীতে ভরে গেছে। মাঠটা আর খালি থাকে কেন?

—বেটাদের পেটে ভাত নেই কিন্তু আণ্ডা বাচ্ছা দেখো কিলবিল করছে।

—দুর্ মশাই, মানুষ হলে তো জৈব তাড়না ছাড়া আর কিছু থাকত।

—এখন মাঝে মাঝেই কিছু কিছু নাটক দেখা যাবে, কি বল।

—দেখুন না, সমাজ নেই শিক্ষা নেই বলেই কেমন ভাবনা চিন্তাহীন নির্ভার হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। মাঝে মাঝে ইচ্ছে করে, দুর্ ছাই সমাজ শিক্ষা, হন্যে হয়ে যাই এদের মত। বেশ থাকব। প্রতি পদে পদে মেকী শিক্ষা সভ্যতার কাঁটা গলায় নিয়ে জীবন ভোর করতে হবে না।

পথচারী, আর কোয়ার্টার্সের ভদ্রালোকদের মুখে এমনি ধরনের আলাপ আলোচনা শোনা যায় কখনো কখনো। সকলেই যে একরকম তা নয়, ব্যতিক্রম আছে বৈকি ?

কিন্তু ভারতবর্ষের সব প্রদেশ থেকে ভিড় করে আসা এই দুর্ভাগ্য-পীড়িত, ছিন্নমূল যাযাবর মানুষদেরও বোধ হয় ঘর বাড়ি ছিল, আশা আনন্দ ছিল একদিন। আজ নিঃস্ব রিক্ত সর্বশূন্য। জীবনধারণের জন্য প্রকৃতিগত জৈব তাড়না ছাড়া আর কোন সদ্ইচ্ছা, কোন অনুভাবনা তাদের আকুল করে বলে মনে হয় না। মনে হয় না সমাজ আছে, শাসন আছে। লজ্জা বলে কোন আবেগেরও বুঝি বড় একটা ধার ধারে না ওরা। ওরা বুঝি কপট হিংস্র। ওরা যেন শিক্ষা সভ্যতা বিবেক বর্জিত। ওরা বুঝি বিতিকিচ্ছি রকমের মতলব-বাজ। ওদের যেন ন্যায় নেই নীতি নেই। প্রয়োজন বুঝি ওদের কাছে সর্বস্ব। প্রয়োজনে ওরা বাঁচে, প্রয়োজনে ওরা মরে। সভ্য সমাজের চোখে ওরা বুঝি আবর্জনা।

তবু যখন আকাশের এই সামিয়ানার নিচে কিছুটা সাথীত্ব আর সম্প্রীতির মধ্যে বসবাস করছে তখন মনে হওয়া অস্বাভাবিক নয় যে, ওদেরও একটা সমাজ আছে। হোক তা বিশ্রস্ত বিজাতীয়। হয়তো

সেই সমাজের অলিখিত কিছু কিছু অনুশাসনও নিশ্চয় আছে? না হলে ওরা পরস্পরের অধিকার, স্বাধীনতা, মর্জি আর মতলবকে পাশে থেকে সহ্য করে কি করে? কি করে পরস্পরের মধ্যে আদান-প্রদান চলে?

রেলওয়ে কোয়ার্টার্সে একটি মানুষের সমবেদনার মন রাত্রির নিঃশব্দ জানালায় দাঁড়িয়ে আরও নিঃশব্দ একটা আত্মার প্রতিধ্বনি যেন শুনতে পায়—মিথ্যা নয় ওরা ক্রুদ্ধ হয়; হাসে, ফিশ্ ফিশ্ করে কথা বলে, মিথ্যা নয় রাত্রির অন্ধকারে বিচিত্র জীবন লীলার হাতের পুতুল হতে ওদের বাধে না। সত্যি যে, ওরা দুর্ভাগ্যের হাঁড়ি-কাঠে মাথা রেখে বেঁচে চলেছে কোন রকমে। কিন্তু মিথ্যা এই কথা, ওরা মানুষ নয়। মানুষের সমস্ত প্রয়োজন নিয়েই ওরাও মানুষ। ওরাও বাঁচতে চায়। বাঁচতে চায় আর সকলের মত আশা আনন্দ ভবিষ্যৎ নিয়ে। ওরা সমাজ-ব্যবস্থার যূপ-কাষ্ঠে পীড়িত নির্য্যাতীত:কিন্তু ওরা নিয়ম-রহিত নয় একেবারে।

মাঠটার একপাশে যেখানে গাছগুলো ঘন হয়ে আছে, উত্তরের যে অংশে রেল-ইয়ার্ডের উঁচু শক্ত পাঁচিল, আস্তানাগুলো সেখানে চাক্ বেঁধেছে বেশী। আস্তানা বলতে ছেঁড়া চট, তেরপলের খানিকটা, টিন, এ্যাসবেস্টসের টুকরা, হোগলা, দড়মা, পিচ্‌বোর্ড, ইঁট কাঠের আবর্জনার স্তূপ। তাতে রোদ বৃষ্টি কোনকিছুর প্রবেশ নিষেধ নেই। মৃদু বর্ষায় একোণে সেকোণে স্থান বদল করে চালানো যায়। প্রবল বর্ষণে আশ্রয় নিতে হয় রেল-কোম্পানীর শেডের নিচে। ওদের ডেড়াগুলো তখন কুকুর বেড়াল শেয়ালের আস্তানা হয়ে ওঠে। ঝড় ওদের তাসের ঘরকে নিয়ে বিদ্রূপ করে, খোলামকুচির মত ঝুঁটি ধরে নাড়া দেয়, এটা সেটা ছুড়ে ফেলে দেয় এখানে সেখানে। ওরা নিরুপায় হয়ে দেখে, সহ্য করে। ওরা যেন মার খেতেই শিখেছে—মারতে নয়। মানুষের সমাজ, প্রকৃতির নিয়ম ওদের বিরুদ্ধে কিন্তু বিদ্রোহের মন্ত্র ওরা জানে না। জোড়াতালি দিতে দিতে ক্ষুব্ধ

হয়, আস্ফালন করে। শুধু মাত্র সেটুকুই তাদের সম্বল, আর কিছু নয়।

তবু ওরা মরে যায় নি। ওরা বেঁচে আছে। আরো বাঁচতে চায়। বুঝি বা ইচ্ছেও করে বাঁচার মত বাঁচতে। মানুষের মত বাঁচতে।

বছর পাঁচেক আগে ঝুপ্‌ড়া বট গাছটার নিচে প্রথম এসে আস্তানা গেড়েছিল সনাতন। বর্ধমানের কোন গাঁয়ে বুঝি একদিন ঘর ছিল তার। মুনিস খেটে কায়ক্লেশে জীবিকা চালাতো। বন্যায় হাজার হাজার মানুষের সঙ্গে সনাতনও বাস্তুচ্যুত হয়েছিল। স্ত্রী আর বারো তেরো বছরের মেয়েটিকে নিয়ে জীবনের তাগিদে শহরের দিকে চলে এসেছিল। প্রথম প্রথম পথে পথে দুয়ারে দুয়ারে ভিক্ষা করে বেড়াতো। কেউ কাজের কথা বললে কাজ করে দিত। তার পর আস্তে আস্তে গতর খাটিয়েই অন্ন সংস্থান করতে চেষ্টা করেছে সে। মেয়েটি ছিল ফর্সা। দেখতে শুনতেও ভাল হয়েছিল বলে ওকে ডাকতো সুন্দরী বলে। সনাতন যখন কাজে বার হতো ওরা এই মাঠের গাছের নিচে ইঁটের উনুনে মাটির হাঁড়িতে রান্না করতো। সম্পত্তির মধ্যে ছিল ছেঁড়া কাঁথা কয়েকটা, শতছিন্ন জামা কাপড় আর গোটাকয়েক কলাই-এর বাসন। রাত্রিবেলা দুটো পোটলায় সব-কিছু ঢুকিয়ে নিয়ে ষ্টেশনের কোন একটা শেডের নিচে আশ্রয় নিত। ভোরে ভোরে ফিরে আসত। তার পর একটি দুটি করে খুঁটি গেড়েছে, চট টাঙিয়েছে, হোগলার বেড়া দিয়েছে; আস্তানা গড়ে উঠেছে।

আর সব শেষে যে এসেছে সে নন্দ। নন্দ গায়েন। নন্দর বাড়ি ছিল মেঘনা পেরিয়ে ত্রিপুরা জেলার রঘুনন্দন পাহাড়ের কাছাকাছি কোথাও। ভাগ চাষের চাষী ছিল। প্রকৃতি মনিব আর জীবনের কাছে দাসখৎ লিখে দিয়ে বোকার মত নিয়তির কাছে হাজিরা দিতে হতো তাদের। শিশুকাল থেকেই নন্দর সময় কাটতো

গানের আড্ডায় আড্ডায়, বাউল, বৈরাগীর দাওয়ায় দাওয়ায়। বাপ বেঁচে ছিল বলে নিজের হাতে চাষ-বাস করতে হয়নি তাকে। কিন্তু লাঙল দেবার সময়, ফসল পাকার সময় কিংবা ফসল কাটার সময় মাঠে মাঠে ঘুরে বেড়াতে না পারলে ভাল লাগত না তার। এ-মাঠে ও-মাঠে নন্দর গলায় শোনা যেত বাউল আর ভাটিয়ালী সুর। আশ্চর্য সহজ স্বতস্ফূর্ত আর সুন্দর ছিল সে সুর।

দূর প্রান্ত থেকে ডাক আসত—হেই-ই-ই-ই নন্দ—। এখনো মাঝে মাঝে স্মৃতির ভেতর সেই অন্তরঙ্গ আহ্বান যেন শুনতে পায় নন্দ।

তার পর চিরকাল পাশাপাশি বাস করে আসা সেই আত্মীয় মানুষগুলো যেন কাদের উস্কানিতে উল্লসিত রক্ততৃষা নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল তাদের উপর একদিন। রক্ত! রক্ত! আর কি নৃশংসতা? বাপ-মায়ের রক্তাক্ত দেহ আর মানুষের বিষাক্ত স্মৃতি নিয়ে দেশান্তরী হলো নন্দ। তারপর ঘুরতে ঘুরতে ঠোক্কর খেতে খেতে এখানে এসে পৌঁচেছে। নন্দ ভাবে, এই স্থানবদল আর যাযাবর বৃত্তি নিয়েই বোধ হয় জীবন কাবার হয়ে যাবে। কেন? কে জানে, বুকের ভেতরে একটা কষ্ট ধক্ করে ওঠে তখন। সেই কষ্টটা যেন লুকিয়ে লুকিয়ে দেহের ইন্দিতে ছিন্দিতে ঘুরে বেড়ায়, চোখ মোছে।

নন্দ তখন দোতারাতে ঝংকার দিয়ে গলায় সুর তোলে—'অচেনা এক পাখী আমার, খাঁচার ভেতর করে খেলা।'

এ ছাড়া আছে কাগজ কুড়ানেওলা শশী বাউড়ী আর তার বউ চারু। বাড়ি বাড়ি থেকে শিশি বোতল কিনে নিয়ে বাজারে চালান দেয় ছাপ্‌রা জেলার রামচরণ। তার বউ ও দেড় গণ্ডা ছেলেমেয়ে। বড়শী—বড়শীর সুতো, তাগা, তাবিজ দাঁত খুট্‌নী ও কান খুট্‌নী ইত্যাদি রাস্তায় বসে বসে বিক্রী করে উড়িষ্যার মহেশ সামন্ত। তালা চাবিওলা তিন আঙ্গুল কাটা একচোখ কানা হরেকেষ্ট আর তার বউ বিন্দী। লোকে বলে, ওই যে পাঞ্জাবী টোট্‌কাওলার ঘরে হরিমতী থাকে, বিন্দী নাকি তারই মত ছিনালী। মধ্য প্রদেশের

কোথায় যেন বাড়ি ছিল বিন্ধেশ্বরের, সে কাজ করে ঝালাই এর। তার বুড়ী ঘুঁটে বিক্রী করে রেলওয়ে কোয়ার্টার্সে। এছাড়া আছে গুণ্ডা প্রকৃতির কানাই মান্না, ত্বলে বাগ্দী, অটলবিহারী, হজমীগুলি বিক্রেতা সুখনরামজী। আর যারা আছে তাদের কোন নির্দিষ্ট বৃত্তি নেই। ওরা ভিক্ষা করে, কাজ পেলে কাজ করে, সুযোগ পেলে এখান সেখান থেকে এটা সেটা সরিয়ে আনে। মাঝে মাঝে পুলিস আসে, একে ওকে ধমকায়, তু-একটাকে কোমরে দড়ি বেঁধে নিয়ে যায় থানায়। আর আড্ডা, গল্প গাছা কিংবা জৈব তাড়না নিয়ে আসে রেলওয়ে কুলিরা, নিচু স্তরের কর্মীরা। সন্ধ্যার পর কাজ কর্ম থেকে ফিরে এসে ইটের উনুনে রান্না চড়ায় সকলে। বেশ জমজমাট হয়ে ওঠে মাঠটা তখন।

সনাতন ছিল এই মাঠের আদি বাসিন্দা। বোধ করি পুরানো বাসিন্দা বলেই সনাতন এখানকার একজন মোড়ল হয়ে উঠেছিল। কোন ঘটনা ঘটলে সে তা আগে জানতে পারতো। নানা রকমের শলা-পরামর্শ করতে আসতো অনেকেই। গুণ্ডা প্রকৃতির কানাই মান্না, ত্বলে বাগ্দী, অটলবিহারীর মত মানুষগুলোও সনাতনকে বেশ খাতির করতো। সনাতনের কথা বেদ-বাক্য বলে মেনে নিতে চেষ্টা করতো। সনাতন যদি কখনো বিড়ি ফুঁকতে ফুঁকতে বলত—একটু চা খাও।—সেদিন ওদের প্রাপ্তি যোগটা পরম বলে মনে করতো ওরা। বারো-তেরো বছরের সুন্দরী এখন বুকের ভেতরে গাঢ় বসন্তের যৌবন নিয়ে অষ্টাদশী হয়ে উঠেছে। সেই অষ্টাদশীর হাতের চায়ের জন্য ওরা জান কবুল করতে পারতো।

সুন্দরী মুখ আড়াল করে হাসতো আর মনে মনে বলতো—যত সব নেড়ী কুত্তার দল।

সনাতন কাজ থেকে ফিরে এসে সবেমাত্র একটা বিড়ি ধরিয়েছে, এমন সময় ত্বই লাঠিতে ভর দিয়ে উপেন এসে দাঁড়ায়। রেলের

নিচে পড়ে ডান পাটা কেটে গিয়েছিল উপেনের। আগে ছিল দুর্দান্ত লোক। এখন পথে পথে হাত পেতে পেতে মানুষের অনুগ্রহ কুড়িয়ে বেড়ায়। ধর্মভীরু বলেও তার বেশ সুনাম আছে এখানে।

—খুড়ো কখন ফিরলে।

—এই এসেছি। বসো উপেন।

উপেন লাঠি দুটো রেখে সনাতনের সামনে বসে বলে—বুঝলে খুড়ো, নিয়ে এলাম ছোঁড়াটাকে। বললাম, এখানে একা একা পড়ে থাকবে কেন? চলো, কিছু মানুষ-জন তো আমরা ওখানে আছি। তা ছোঁড়া আজ রাজী হয়ে গেল।

—কার কথা বলছ উপেন। সেই গায়েনের কথা নাকি?

—আবার কার কথা? খুড়ো, একবার শুনলে তারিফ না করে পারবে না তুমি এই আমি বলে রাখছি। খাসা গায় ছোঁড়া।

সুন্দরী এলুমিনিয়ামের বাটিতে চায়ের জল চাপিয়ে ছিল। উপেনের কথা শুনে সে একবার ফিরে চেয়ে বলে—কখন গাইবে উপেন দাদা।

—এখানেই তো থাকবে এখন। রোজই গাইবে, কত শুনতে পাবি।

—সেবার যে একজন এনেছিলে, তেমন শেয়ালের মত গলা নাকি উপেন দাদা।—বলে মুখে কাপড় চাপা দেয় সুন্দরী।

—হঃ হঃ শুনলেই বুঝতে পারবি। হ্যাঁ গা মেয়ে আমাকেও একটু চা দিস্। তা খুড়ো; তুমি যে বলেছিলে তোমার বাবুদের দোকান থেকে সস্তায় কাপড় এনে দেবে।

—বলেছি তো! দেবে দেবে করছে। বুঝলে উপেন, জাতে তো সাহা, পিঁপড়ের পেট থেকে চিনি বার করে নিয়ে তবে তো। শালার ভদ্রলোক কত দেখলাম তো?

সুন্দরী কলাই-এর গ্লাসে করে দু'গ্লাস চা এনে রাখে তাদের সামনে। বলে—সব মানুষ তো আর একরকম না। ভাল মানুষ

নেই বুঝি তা বলে ? এই দেখ না উপেন দাদা, আমার বাবুরা এই নূতন শাড়ি জামা, পুরানো চাদর দুটো, এলুমিনের ডেক্‌চিটা দিয়েছে। ভাল লোক না হলে দেয় ?

—তা ছোট মাষ্টারবাবু লোক তো ভালই।

—বৌদিদিও খুব ভাল। আমাকে বলে, তুই ওখানে থাকিস্ কি করেরে সুন্দরী। তোর ভয় করে না। আমি হেসে বলি, নেড়ী কুত্তার দলকে আবার ভয় ? এক লাথি মেরে দাঁত ভাঙব, নয়ত চোখ উপড়ে ফেলব।

উপেন হেসে সনাতনকে বলে—বুঝলে খুড়ো, সুন্দরীর মুখে মধু আর বিষ দুটোই আছে। কানাইটা পর্য্যন্ত ওকে ভয় করে।

সুন্দরী মাটির কলসী আর একটা বালতি হাতে রেলওয়ে কোয়ার্টার্সের দিকে চলে যায় জল আনতে।

—মেয়েটার একটা গতি করলে না খুড়ো। চারিদিকে নেকড়ের দল ওৎ পেতে আছে। একটা ভাল জিনিস নষ্ট হয়ে যাবে মনে হলে আজকাল কষ্ট হয় খুড়ো।

—মনে মনে তো আছে উপেন, কাজে আর হয় কই। সারাদিন যায় বাবুদের গদীতে। এখানে ওখানে কোন শালাকে দেখতে পাই না উপযুক্ত বলে। বাবুদের বাড়িতে কাজ করে করে সুন্দরীটাও বাবু হয়ে গেছে এখন। মান্না তো কম রোজগার করে না। ও তো মুখীয়ে আছে, বললেই হয় শুধু! তা সুন্দরী বলে—ওটা তো গুণ্ডা, খুনে। বুঝে দেখো উপেন।

উপেন বলে—সুন্দরী ঠিক কথাই বলেছে খুড়ো। কানাই একদিন বেঘোরে মরবে দেখো।—তার পর কানের কাছে মুখ এনে ফিস্ ফিস্ করে বলে—শালা ডাকাত।

সনাতন চায়ের গ্লাস নামিয়ে রেখে উপেনকে একটা বিড়ি দিয়ে নিজে একটা ধরিয়ে বলে—তা গায়েন ছোঁড়া কোথায় আছে, তোমার ডেরায় ?

—বলেছি থাকো কয়দিন। তার পর ডেরা তৈরী করে নিও।

—রোজগার কেমন উপেন।

—তা কি আর জেনেছি খুড়ো। তবে ছেলেটি কথাবার্তায় খুব ভাল এ আমি কিড়া কেটে বলতে পারি। রাতে যেও একবার, শুনলে মনটা ভাল লাগবে খুড়ো।

উপেন উঠে লাঠিতে ভর দিয়ে ধীরে ধীরে বাজারের দিকে চলে যায়।

বাবুদের বাড়ি থেকে জল নিয়ে আসবার পথে কি মনে করে উপেনের ডেরাটার কাছ দিয়ে আসতে আসতে ভেতরে একবার উঁকি মারে সুন্দরী। দেখতে পায় শক্ত কালো পাথর দিয়ে তৈরী একটা বাইশ তেইশ বছরের মূর্তি তার দোতারা যন্ত্রটিকে ছাপ্-ছোপ্ করছে। বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। মুখে শিশুর মত সরলতা আর বোকা বোকা একটা ভাব দেখে সুন্দরীর একই সঙ্গে হাসি পায় আর মমতার মন সজাগ হয়ে ওঠে। সংসার অনভিজ্ঞ আর নেহাতই কচি কচি মনে হয় গায়েনকে তার।

বালতিটা মাটিতে রেখে কলসী কাঁখে সুন্দরী বলে—তুমিই গায়েন বুঝি ?

নন্দ চমকে ওঠে। তার সরলতা মাখা বিষণ্ণ চোখ দুটিতে খানিকটা বিস্ময় ফুটে ওঠে। বিমূঢ় আর বোকার মত প্রশ্ন করে নন্দ—তুমি কে ?

সুন্দরী মুচকি হেসে বলে—আমি তোমার যম।

নন্দ থতমত খেয়ে চোখ নামিয়ে নেয়। এ কোন দিশী কথা ! বিরক্ত হলেও কোন উত্তর দেয় না নন্দ। এসে পর্যন্ত কোন মতেই ভাল লাগাতে পারছিল না সে জায়গাটাকে। লোকগুলো তারই মত, হয়তো তার চাইতেও দুর্ভাগ্যপীড়িত। কিন্তু আবহাওয়াটায় কেমন যেন একটা অস্বস্তি আর নোংরামীর আভাস ঝিলঝিল করছে।

—কি, কথাটা কানে গেল না বুঝি।—সুন্দরীর কণ্ঠে যেন ধমকের সুর। সুন্দরী এই একটু সময়ের ভেতরেই যেন নন্দ গায়েনের আগা-পাছতলা বুঝে নিয়েছে।

নন্দ সশংকিত চোখ তুলে নিরুপায়ের কণ্ঠে বলে—কি ?

—তুমিই গায়েন বুঝি।

—হ্যাঁ।

—কোথায় গাও, বন-বাঁদারে না ধোপার বাড়িতে ?

নন্দ এবার মনে মনে ক্রুদ্ধ হয়, তার চোখে মুখে বিরক্তির ছায়া ভাসে। ফস্ করে তার মুখ দিয়ে বেরিয়ে যায়—তুমি তো বড় অসভ্য।—বলেই ভয় পেয়ে চোখ নামিয়ে নেয় নন্দ আর কম্পিত হাতে আবার যন্ত্রটাকে পরিষ্কার করতে আরম্ভ করে।

—ওরে ব্যাস, আবার ফোঁসও আছে দেখছি।—বলে সুন্দরী খিল্ খিল্ করে হেসে উঠে বালতিটা হাতে তুলে নিয়ে তাদের আস্তানার দিকে চলে যায়।

নন্দ সেদিকে চেয়ে চেয়ে অবাক হয়। কি যেন একটা কথা তার মনে পড়তে চায়। তার ভয় ভয় করে। নন্দ আনমনে ভাবতে থাকে ; এ কোথায় এল সে ? আবার ভাবে এসেছ তো কি হয়েছে ? আবার যেদিন খুশী চলে যাবে অন্য কোথাও। দাসখৎ তো দেয়নি কাউকে ? উপেনের ধর্মভীরু মনটা তাকে কেমন যেন নরম করে দিয়েছিল। তাই না তার কথা ঠেলতে পারেনি নন্দ ?

যন্ত্রটা থেকে হাত গুটিয়ে নিয়ে নন্দ একবার আড়চোখে সুন্দরীর গন্তব্যটা খোঁজ করে। এখানকারই বাসিন্দা বোধ হয় মেয়েটা। নইলে আর এমন কথা হয় ? কিন্তু মেয়েটা কে ? বেশ ডাগর ডাগর, বিয়ে হয়নি কেন এখনো কে জানে ? সুন্দরীকে এখনো দেখা যাচ্ছে, আটো সাটো শরীরে তার চলাটা যেমন উচ্ছল তেমনি যেন একটা লাউডগা সাপের প্রতিভাসে শির্ শির্ করে শরীর।

ছোট ছোট চোখ দুটিতে বুদ্ধি আর শ্লেষ মিলেমিশে কি অদ্ভুত একটা সম্মোহন সৃষ্টি করেছিল বুঝি। পাত্‌লা ঠোঁট দুটির হাসি তলোয়ারের মত ধারালো হলেও বিরক্ত করেছিল নন্দকে। নন্দ এক পলকেই বুঝতে পেরেছিল মেয়েটার শাড়িতে, গায়ের রং-এ, চুলে এই পরিবেশের আভাস্ এত কম যে, তাকে অন্য এক সমাজের মেয়ে বলে মনে হয়। তা ছাড়া তার কথার সুরে ছিল কেমন একটা খবরদারীর সুর। যেন এই সাম্রাজ্যের সেই সম্রাজ্ঞী। নন্দ মনে মনে বিশ্রী একটা বিকর্ষনের সঙ্গে খানিকটা যেন আকর্ষণও অনুভব করে তার তারুণ্যের রক্তাক্ত বলিষ্ঠতায়।

উপেন বাজার থেকে ফিরে এসে কাঠের উনুনে আগুন জ্বালাতে জ্বালাতে আক্রোসের সঙ্গে বলে— বুঝলে গায়েন, আমি ভিখারী বলে আমার ডিম খেতে মানা। শালাদের কথা শোন—বলে কিনা ভিখারীর বাচ্চা ডিম খাচ্ছিস যে, বড়লোক হয়ে গেছিস নাকি ? পা'টা বাবা বিশ্বনাথ নিয়ে নিল তাই না গোঁসাই হয়ে যেতে হয়েছে। পা থাকলে এক লাথি মেরে শালাদের মুখ থেঁতলে দিতাম।

নন্দ তার এই যাযাবর জীবনে লোকচরিত্র কম দেখেনি। ভালমন্দ দেখেছে, পাপ পুণ্য দেখেছে, মায়া যেমন দেখেছে তেমনি নিষ্ঠুরতাও কম দেখেনি। এখন যেন সব গা' সহা হয়ে গেছে। কিন্তু তার মনে অস্পষ্টভাবে মাঝে মাঝে যে আভাস জেগে ওঠে সেটা যেন একটা বেহিসেব বেনিয়ম, মানুষে মানুষে, সমাজে সমাজে। অথচ, দেখো, ভিখারী চাষাভূষো, ছোটলোক, বড়লোক সবাই তো একই রক্ত-মাংসের মানুষ ? সুখ-দুঃখের বোধই বা আর কার নেই ? পৃথিবীতে এই নিয়মটা কেমন করে হল নন্দ ভেবে পায় না।

নন্দ বলে—উপেনদা তুমি বসো। আগুন ধরিয়ে হাঁড়িটা আমি চাঁপিয়ে দিচ্ছি।

—কি যে বলো গায়েন ? তুমি আমার অতিথি, নারায়ণ। আর কত গুণী। আমি বন-শূয়োর কত পাপী। না হলে এ অবস্থা

হয় আমার। তুমি ভগবানের গান গাও। দু'চার দিন আমার হাতে খেলে আমার পাপ কাটবে যে গায়েন ?

নন্দ বসে বসে উপেনের কাজ দেখতে থাকে।

—উপেনদা !

চাল ধুতে ধুতে মুখ ফিরিয়ে উপেন সাড়া দেয়—কি গায়েন ?

নন্দ সসংকোচে বলে—তুমি বাজারে যাবার পর একটি মেয়ে এসেছিল। কি চেটাং চেটাং কথা তার। কাউকে মানুষ বলেই গ্রাহ্যি করে না।

—কে আবার এল ? অল্প বয়সের ছুঁড়ি তো ? তা বোধ হয় সুন্দরীই এসেছিল। সনাতন খুড়ো তো মুরুব্বী, তোমার কথা বলছিলাম তাকে। তা মেয়েটা ঠাস্ ঠাস্ কথা বললে কি হবে, মনটা ভাল গায়েন। দেখতে শুনতেও ভাল। ভদ্দর লোকের মেয়ের মত দেখায় তাকে। আমি তো খুড়োকে বলি, মেয়েটার একটা গতি করো খুড়ো।

—মেয়েটা বুঝি কাউকে ভয় করে না।

—তাকেই ভয় করে সকলে। কানাই, ভুলে অটলা আরও সব আটকুঁড়ের বেটারা নেকড়ের মত ওৎ পেতে আছে। কেউ ঝাঁপ দিলে অন্যেরা তার গর্দ্দান নিয়ে নেবে। তাই তো সকলে সাধ্য সাধনা করে মন জয় করতে চায় ; এটা সেটা এনে দেয়। সুন্দরী ছুড়ে ফেলে না দিয়ে ঠোঁট বেঁকিয়ে বলে—ছে ছে এ আবার একটা জিনিস নাকি ?

—মেয়েটা আচ্ছা ধড়িবাজ তো উপেনদা।

—আসলে কি জান গায়েন—ছোট মাস্টার বাবুর বাড়িতে কাজ করে করে সুন্দরীও ভদ্দর লোক হয়ে গেছে। ওরা ওকে খুব ভালবাসে কিনা।

নন্দ ভাবে সুন্দরীকে দেখে বেশ হাফ ভদ্রলোক বলেই মনে হয়েছিল তার। যেন মেয়েটা এই পরিবেশে থেকেও এর আওতার বাইরে চলে গেছে একটু একটু করে। ওই তো উপেনদা বললে—

মাষ্টারবাবুর বাড়িতে কাজ করে করে নাকি ভদ্রলোক হয়ে গেছে। কিন্তু কেন যে নন্দর মনে একটা দুশ্চিন্তার ছায়া নামে তা সে বুঝতে পারে না। শত হউক মেয়ে তো, কত ''ার জোর তার। নেকড়ের দল ক্ষুধায় অতিষ্ঠ হয়ে হয়ে যেদিন ঝাঁপিয়ে পড়বে সেদিন কি হবে সুন্দরীর? সেদিন নখে, দাঁতে আঁচড়ানো খুবলানে ওর দেহটার কল্পনা করতেও ভয়ে আঁত্‌কে ওঠে নন্দ।

—উপেনদা!

—কি গায়েন?

—এখানে থাকতে হবে বলে আমার কেমন ভয় ভয় করছে।

উপেন দড়াম করে নিজের বুকে একটা সশব্দ থাপ্পর বসিয়ে দিয়ে বলে—উপেন সাঁত্‌রা থাকতে তোমার কোন ভয় নেই গায়েন। আমি সব শালার নাড়ী-নক্ষত্র জানি। বেশী চালাকি করলে বেটাদের শ্বশুর বাড়ির খানা খেতে পাঠিয়ে দেব না?

উপেনের কথা শুনে নন্দর ভয় কমে না বরং সন্ত্রস্ত হয়ে ওঠে তার মন। কিছু ব্যাপার আছে নাকি এখানে? এখানে সকলেই প্রায় অন্ধকার সমাজের অধিবাসী। মান নেই, মর্যাদা নেই, স্বাস্থ্য নেই, সহানুভূতি নেই। মনুষ্যত্ব আর থাকবে কি করে? হয়তো এই অন্ধকার ওদের আরো কোন কোন অন্ধকার জীবনের পথে ঠেলে ঠেলে দিচ্ছে দিনের পর দিন।

নন্দর মনে হয় উপেনও এক সময় ধোয়া তুলসী পাতা ছিল না। এক পা নেই বটে কিন্তু কি শক্ত-সমর্থ। লোকটা হঠাৎ ভগবানের উপর এত আস্থাবান হয়ে উঠল কি করে? গানই বা এত ভাল লাগছে কেন তার? আচ্ছা! কোন মতলব নেই তো উপেদার? নন্দ যেন নিজের মনে মনেই লজ্জিত হয়ে জিব কাটে। কিন্তু আশঙ্কাটা একেবারে দূর হয়ে গেছে তাও মনে হয় না তার।

নন্দর চোখ পড়ে বাইরের সমস্ত মাঠটার উপর। কিছু কিছু ডেরায় কেরোসিনের কুপি জ্বলছে। একটা দুটো হারিকেনও বোধ

করি আছে কারো কারো। কেউ কেউ ঘরের বাইরে উনুনে রান্না চড়িয়েছে। গাছের পাতায় পাতায় আলোর আকাশ আবৃত, ছায়ায় ছায়ায় নিচের মাটিতে ঘুটঘুটে আঁধার। কুপি আর উনুনের ঘোলাটে আলোতে মাঠটা যেন কোন এক বিরাটকায় পিশাচের শরীর হয়ে উঠেছে। টুক-টাক কথা, ঝিলিক দিয়ে ওঠা হাসিতে—কোন ডেরাতে উচ্চস্বর ক্রুদ্ধ আক্রোসের ফুল্‌কি, অশরীরি প্রেতাত্মার মত মানুষগুলোর চলাফেরা আর গোপন ফিসফিসানিতে নন্দর সমস্ত অস্তিত্ব ছম্‌ছম্‌ করে ওঠে। ভয়ে তার বুক কাঁপতে থাকে। নন্দ মনে মনে ভাবে আজ রাতটুকু কাটুক—কালই এ শহর ছেড়ে পালাবে সে। এখানে থাকলে উপেন তাকে রেহাই দেবে না। ছিনে জোঁকের মত লেগে থাকবে তার পেছনে। কত কাল থেকেই তো এই যাযাবর বৃত্তির অক্ষরেখায় ঘুরছে আর ঘুরছে নন্দ। তার জন্য ভয় করে নাকি সে? যেখানেই যাক—দোতারাতে ঝংকার দিয়ে গলায় সুর তুললেই পেট চলে যাবে তার। একলা মানুষ ঝাড়া হাত-পা। সুখ না থাক স্বস্তি তো থাকবে।

দিন কয়েক ধরেই রাত্রির খাওয়া দাওয়ার পর উপেনের ডেরায় গানের আসর বসছে।

সনাতন প্রতিদিনই যায়। আজ সে চলে যেতেই সুন্দরী দরজার ঝাঁপটা বন্ধ করে তার নড়বড়ে দড়ির খাটিয়াটায় শুয়ে পড়ে। হাত বাড়িয়ে ছোট হারিকেনের আলোটাকে আরো কমিয়ে দেয় সে। খানিকটা সময় চোখ বুজেই কি যেন ভাবে সুন্দরী। এর আগে ভাবনা চিন্তার বড় একটা ধার ধারেনি সে। আজ কয়দিন থেকেই কেমন একটা ভাবনা এসেছে, উন্মনা ভাবনা। অকস্মাৎ সেটা যেন মনের ভেতর একটা চঞ্চল হাওয়ার ঝাপট মারে, বেদনা দেয়, উদাস করে তোলে। এতদিন পর একটা কিছু ভাবনা, কিছু একটা স্বপ্ন গুঞ্জন করে উঠেছে বুঝি তার মনে।

সুন্দরী চোখ খুলতেই বুকের দিকে দৃষ্টি পড়ে তার। বুকের উপর থেকে কখন যেন আঁচলটা সরে গিয়েছিল। সুন্দরী দেখতে পায় তার পুরুষ্টু সুডৌল বুকের অস্তিত্ব আর সেখানে নেই। একটা যেন মালভূমি। সব জেনে বুঝেও তড়াক্ করে উঠে বসে সুন্দরী। সাগ্রহে বুকের উপর দৃষ্টি ফেলে সে ; তার মুখে তৃপ্তির খুসীর হাসি ফুটে ওঠে। আবার টান্ টান্ হয়ে শুয়ে পড়ে সুন্দরী।

সেদিন বিকালের সেই কথাগুলোই মনে করে এখন খুব হাসি পায় সুন্দরীর। সুন্দরী নাকি বড় অসভ্য। কথাটা এমন চোখ চেয়ে, এমন সুরে বলেছিল নন্দ, রাগ করা তো দূরের কথা মায়া হয়েছিল আর পেট ফুলে উঠেছিল হাসিতে। শুনে মনে হয়েছিল হ্যাতা-গোবরে মানুষ। সংসারের সাত-পাঁচ বোধ হয় দেখেনি এখনো। আহা! এমন বাউণ্ডুলে হল কেন? মা বাপ্ নেই বোধ হয়। শিশুর মত কি এক সুন্দর সরলতা মাখানো ছিল মুখে, চোখে কেমন একটা নিষ্পাপ ঘোর। ধক্ করে শব্দ করে উঠেছিল সুন্দরীর বুকের ভেতরটা। সুন্দরীর ইচ্ছা করছিল বুড়ো খোকাকে পিঠে হাত বুলিয়ে বুলিয়ে সান্ত্বনা দেয়। আহা বেচারা, এই মাঠের হাওয়ায় এসে বোধ হয় ভড়কে গেছে খুব।

এই সময় উপেনের ডেরা থেকে গাছের পাতাদের সর্ সর্ শব্দের সঙ্গে গানের সুরও ভেসে আসে। একতারে গাইছে বুঝি নন্দ গায়েন—

আমার একলা যেতে ভয় করে
চল গুরু যাই দু'জনে।
আমার দেহ ছিল শ্মশান সমান
গুরু এসে মন্ত্র পড়ে করলে তাকে ফুলবাগান।

সুন্দরীদের আস্তানা থেকে একটু দূরে হলেও নিরিবিলি রাত্রিতে নন্দর গলা স্পষ্টই শুনতে পায় সুন্দরী। শুনতে পেয়ে কখন এক সময় বড় বেশী উৎকর্ণ হয়ে ওঠে। সুন্দরী মাষ্টারবাবুর বাড়িতে দু'বেলা গান শুনে শুনে তার কান দুটোকে রসিকই করে তুলেছিল।

নন্দ গায়েনের দরাজ ঝরঝরে গলা তাকে যেন একটা আলাদা আস্বাদের স্পর্শ দিয়ে যায়। ভারী ভাল গায় তো গায়েন?—সুন্দরী ভাবে।—বুঝি প্রাণের সব আবেগ, সব দরদ ঢেলে দিয়ে গাইছে। আহা! কেমন করে এমন গায় গো!

সুন্দরীর মনে হতে থাকে—এই পত্রাচ্ছাদিত সমস্ত মাঠের অন্ধকার যেন সর্ব শরীরে সেই সুরের মায়া মেখে আরো নিঝুম হয়ে গেছে। অন্ধকার যেন সহস্র চক্ষু হয়ে উঠেছে। ঘরের ভেতরে আলো থাকা সত্বেও অন্ধকার যেন তার চারিপাশে ঘন হয়ে আসে ক্রমশ, তার স্নায়ুকে করে তোলে অবশ বিহ্বল। সুন্দরীর কেবল মনে হতে থাকে—কেমন করে গেয়ে এমন উতলা করে তোলে মানুষের মনকে? কেমন করে এমন গায় গো? গান কেন এমন ভাল লাগে, এমন রক্তে মাংসে ছড়িয়ে পড়ে গো?

সুন্দরী বিছানায় শুয়ে শুয়েই অকস্মাৎ সমস্ত শরীরে মনে ছট্‌ফট্‌ করে ওঠে। বুকের উপর হাত রেখে আঙ্গুলে আঙ্গুলে জড়িয়ে মালভূমি বুকটাকেই আরো যেন চেপে চেপে পাঁজরে বসিয়ে দেবার চেষ্টা করতে থাকে। শুধু তার মনে হয় সুরের ওই বিবশতা নিয়ে নন্দ গায়েনের অস্তিত্ব তার বুকের উপর এই সময় একটা দুর্বহ বোঝার মত চেপে বসেছে। এত ভার কেন তার বুঝতে পারে না সে। সমস্ত শরীরে যেন জ্বালা ধরে যায়; মনটা নির্বোধের মত পুড়তে থাকে কেবল। অবশ্য সুন্দরী জানে, এমন ভার ভার হয়ে ওঠা বুকের অভিজ্ঞতা আজই প্রথম নয়। আরো কয়েকবার হয়েছে, যখন কখনো কখনো বিকেলের কাজে গিয়ে জানালার পর্দার এক চিল্‌তে ফাঁক্‌ দিয়ে চোখ পড়ে গেছে ঘরের ভেতর। মাষ্টারবাবু তো খুব ধীর স্থির শান্ত মানুষ। কিন্তু কি আদর খেতেই না ভালবাসেন! কখনো হয়তো চোখ পড়ে যায় বৌদিদির কাজকর্মের ফাঁকে মাষ্টার-বাবু হয়তো টুক করে বৌদিদিকে বুকে টেনে নিয়ে……অনেকক্ষণ আর কথা বলবার কোন ফুরশুৎই পাননা বৌদিদি। অপ্রস্তুত

বৌদিদি সকোপে চেয়ে থাকেন কিন্তু ঠোঁটে হাসি লেগেই থাকে। কিংবা হয়তো দেখতে পায় মাষ্টারবাবু ইজিচেয়ারে শুয়ে আছেন আর বৌদিদি পাশে বসে চুলে আঙ্গুল বুলোতে বুলোতে নিজের আনন্দে কত কথাই না বলে যাচ্ছেন। তখন এমনই একটা ভার ভার ভারাক্রান্তিতে ভরে ওঠে বুক। শরীর জ্বলতে থাকে, মন পুড়ে যায়। সুন্দরীর সুন্দর মুখটা কালো কালো হয়ে ওঠে।

বৌদিদি হয়তো কখনও জিজ্ঞাসা করেন—কিরে ; এমন মুখ গোমড়া করে আছিস কেন ?

—গোমড়া আবার কোথায় দেখলেন বৌদিদি।

—তা হলে বঁটি সামনে নিয়ে মাছে কেবলই ছাই মাখছিস্ কেন বসে বসে। মাছ কাটবি কখন ?

সুন্দরী ব্যস্ত হয়ে উঠত—এই এখনই দিচ্ছি।

—তোর মাঝে মাঝে কি হয় বল তো সুন্দরী ?

ধরা পড়বার ভয়ে যেন ছুঁচোর মত মনের কোণে ঘাপটি মেরে থাকতে চাইত সুন্দরী—কি আবার হবে। আমার বুঝি দুঃখ-কষ্ট থাকতে নেই ?

—বল না কি দুঃখ তোর ?

—আমি জানি নাকি ঠিক। কত কিছু মনে হয়। আচ্ছা বৌদিদি, আপনার মা বাবার কাছে যেতে ইচ্ছে করে না ?

—করবে না কেন। কিন্তু যাই কি করে ? তোর দাদাবাবুর তো আমাকে না হলে একমুহূর্ত চলে না। তুই বুঝি জানিস্ না কিছু ?

সুন্দরীর সমস্ত মুখ আরক্ত হয়ে উঠত। শরীরের ভেতর কেমন একটা সুখ আর আশা জ্বলতে পুড়তে আরম্ভ করত। তাজা কই মাছটা সরাৎ সরাৎ করে হাত ফস্‌কে ফস্‌কে যেত কেবল।

সুন্দরী সচেতন হয়ে উঠতেই নন্দ গায়েনের গলা আবার কানে এসে বাজে। এখন রাত আরও নিশ্চুপ নির্নিমেষ হয়ে আসতে দোতারার মধুর ধ্বনিও কানে আসছে একটু একটু। যেন গানের

সুরটাই আবার তারের বুক থেকে গুন্‌গুনিয়ে উঠছে। মনের ভেতর শির্‌শিরিয়ে ওঠা একটা শীতার্ত রোমাঞ্চ অনুভব করে সুন্দরী।

কিন্তু ডেরার আশে-পাশে ঘুর ঘুর করছে না কেউ ?

কৃষ্ণপক্ষের রাত। কোথাও কোন ডেরাতে আলো জ্বলছে না এখন। শুধু জ্বলছে উপেনের আস্তানায়। মাঠের অনেকেই বোধ হয় এখন সেখানে ভীড় করে বসেছে। সেই সুযোগে কেউ হয়তো ওৎ পেতে আছে বাইরের অন্ধকারে সুযোগের প্রতীক্ষায়। পুরুষ মেয়ে সকলকেই প্রয়োজনে কখনো না কখনো বাইরে বেরোতে হয়। অন্য দিন আশে-পাশে মানুষ-জন থাকে। ইচ্ছায় আর অনিচ্ছায় ঠোকাঠুকি হলেই হৈ চৈ উঠবে চারিদিকে ; সেই ভয় না করে পারে না। ইচ্ছায় ইচ্ছায় মিলিত কামনা অবশ্য পাঁকাল মাছের মতই সকলের দৃষ্টি এড়িয়ে যায় অনেক সময়। কিন্তু সব সময় সবকিছুই যে সম্ভব এ বোধ হয় নিয়ম নয় পৃথিবীর।

সুন্দরী উঠে বসে তীক্ষ্ণ ধারালো গলায় শাসিয়ে ওঠে—বাইরে কেরে ?

এক মুহূর্ত বাইরের অন্ধকার স্তব্ধতা থম্‌থমিয়ে ওঠে. নন্দ গায়েনের গলার সুর হঠাৎ অদৃশ্য হয়। তার পরই অন্ধকার ফিস্‌—ফিসিয়ে ওঠে—সুন্দরী চেঁচাস কেন. আমি মান্না।

ঘরের ভেতর সুন্দরী মুখ বেঁকিয়ে একটু হাসে। তার বিদ্রূপাত্মক কণ্ঠ যেন আরও বিষজর্জর আবিলতায় সূচাগ্র হয়ে ওঠে।

—তাই বল, আমি মনে করলাম কোন শেয়ালের বাচ্চা।

অন্ধকারে কানাই মান্নার নেশা ছুটে গেল কিনা বোঝা যায় না। কানাই খেক্ খেক্ করে চাপা হাসি হেসে বলে—সুন্দরী একটা কথা শুনবি—

—কথা বলবার আর সময় পেলে না ?

—রাগ করছিস্ কেন সুন্দরী।

—আহা রে ! রাগ করবে না সোহাগ করবে, কি আমার সাধু

এলেন রে ? আবার মাতাল হয়ে আসা হয়েছে। এখানে কেন, যাওনা বিন্দী ওদের কাছে। তোমাদের রাসলীলা কেউ জানে না মনে করেছ, তাই না ? যত সব খেঁকী কুত্তার দল।

কানাইয়ের সম্বিত ফিরে আসে বলে মনে হয় না। সে তেমনি ফিস্ ফিস্ করে বলে—সুন্দরী তোর জন্য একটা সোনার হার গড়তে দিয়েছি। তোকে খুব মানাবে।

—আগে নিয়ে এস, তার পর তো কথা।

—সুন্দরী একবার বাইরে আয় না মাইরি।

—এই মান্না, তুমি যাবে, না, আমি লোক জড়ো করব। না কাল সকালে পুলিসে খবর দেব বলো।

কানাই এবার বুঝি ভটস্থ হয়ে ওঠে, সম্বিত ফিরে আসে। বলে—যাচ্ছি, যাচ্ছি, এত রাগ করছিস কেন। ভাবলাম একলা আছিস একটু দেখে আসি ; কোন শালা আবার নেকড়ের মত ঘুর ঘুর করছে কিনা ? সুন্দরী······

—আবার কি ?

—পুলিসের নাম করবি না কিন্তু আর। পুলিসের নাম শুনলে আমার মাথায় খুন চড়ে যায়।—তার পর অন্ধকারে এগিয়ে যেতে যেতে আত্মগত ভাবে বলে, মাগীর কথা শুনলেও গা জ্বলে যায়। দাঁড়া টিট্ করে দেব একদিন। পুলিসের ভয় দেখায় শালী। পুলিস তোর মামাশ্বশুর না ? কিন্তু কোন শালা টের পেল নাকি কিছু !

সুন্দরী আবার শুয়ে পড়ে নিশ্চিন্ত হয়ে চোখ বোজে। এইসব উপদ্রব এখন আর উপদ্রব বলেই মনে হয় না। এখানকার নিরিবিলি দুপুরে, অন্ধকার রাতে, নদীতে স্নানের সময় কিংবা প্রাত্যহিক শরীর কৃত্যের সময় ঝোঁপ, ঝাড়ের আশে পাশে কোন না কোন উপদ্রব মূর্তিমান হয়েই থাকে। সুন্দরী জানে, বোঝেও, এখানকার সব বয়সের প্রায় সকলের চোখেই তার সম্বন্ধে কি একটা দুরাশা ঝিল্‌ঝিল্ করে। পুলকিত খুসীতে গর্বিতও বোধ করে সুন্দরী। কিন্তু সে

নিজেও জানে না কেমন করে এক কঠিন অনুশাসনের নিগড়ে এই সব মাংসলোভীদের দূরে-দূরে রাখতে পেরেছে। এখন আর তার ভয় করে না কিন্তু সাবধান থাকে সুন্দরী। কারণ সে স্পষ্ট করে না জানলেও কেমন করে যেন বোঝে এখানের অন্ধকারে জীবনের সুন্দর নিয়ম নীতিগুলো ভূমিষ্ঠ হয় না বলে সে সব একেবারে লয় পেয়ে যায়নি মন থেকে। কিন্তু এই অন্ধকারে সব নিয়মনীতিই পথভ্রষ্ট হয়; এই পরিবেশে ভুল পথই বোধ হয় সঠিক পথ হয়ে ওঠে মানুষের কাছে।

সুন্দরী শুনতে পায় নন্দ তখন গাইছে—

শ্যাম অঙ্গে অঙ্গ দিয়া
আছ কি রাই ঘুমাইয়া
লোকনিন্দার ভয় কি তোমার নাই।

সুন্দরী বুঝতে পারে না হঠাৎ কেন এমন একটা কান্নার ঢেউ বুক ঠেলে তার দু'চোখে এসে জড়ো হয়। বুঝতে পারে না অকস্মাৎ কি আবেগ আর অভিমানে, কেন দুটি উরুর মাঝখানে হাত দুটো রেখে সাঁড়াশীর মত চেপে ধরে হাটু দুটি বুকের কাছে গুটিয়ে এনে শীতার্ত বিড়ালীর মত কুঁকড়ে শুয়ে শুয়ে কাঁপছে সে। সেই পরিমণ্ডলটির মাঝখানে কি প্রলয়ঙ্কর জ্বালা। কব্জী পর্যন্ত দুই হাতের করতল যেন সেই জান্তব হুইলের ঘর্ষণে ঘর্ষণে চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যাবে। তার শ্বাস, প্রশ্বাসের ছন্দে সমতা থাকে না। বেঁচে থাকাটা কষ্টকর, দুঃখ-জনক বলে মনে হতে থাকে।

কিন্তু পরক্ষণেই আশা-আকাঙ্ক্ষার মাঝে বাঁচবার জন্য দেহের রক্তে রক্তে জীবনীশক্তি যেন বৈপ্লবিক প্রস্তুতি নিয়ে রুদ্ধশ্বাস হয়ে ওঠে। স্বপ্নের ভেতরে যন্ত্রণাটা ধাতস্থ হতে থাকে ধীরে ধীরে তার। এমন যদি হয়, সেদিন যদি আসে।

দু'চোখে, শরীরে ঘুম নেমে আসে সুন্দরীর।

কানাই, ফালে অটল গুদামে গুদামে মাল খালাসের কাজ

ছাড়াও হরেক রকম কাজ করে বেড়ায়। যার যত তাগদ, তার তত রোজগার। সঞ্চয় করতে শিখলে ঘর-বাড়ি, জমি-জমা নিয়ে সুস্থ জীবনের প্রবেশপত্র তৈরী করতে পারত। কিন্তু করবে কি করে? নেশা আর বদখেয়াল আছে অঢেল। রোজগারের সিংহভাগটা বেরিয়ে যায় ওদিকের ওই জৈব তাড়নার সুরঙ্গ পথে। তার পর আছে নিশুতি রাতের অন্ধকারে দলবেঁধে অভিযান। কোথায় যায়, কি করে আর কেউ স্পস্ট না জানুক উপেন জানে। কারণ উপেন নিজেই তো পালাতে গিয়ে পা কেটে নির্বিষ গোঁসাই সেজে ভিক্ষা করে পেট চালাচ্ছে এখন।

প্রতিদিনই সন্ধ্যাবেলা তিন ইয়ার—কারো না কারো ডেরায় তাড়ির হাঁড়ি নিয়ে বসে। একটু আড়ালেই বসে। এই আড়ালটা সুন্দরীর ভয়ে। মাতালদের সুন্দরী যে ঘৃণা করে ওরা তা জানে। মদখোরের তক্‌মা নিয়ে সুন্দরীর নেক্-নজরটা হারাতে চায় না ওরা কেউ। অথচ সুন্দরীর উপর ওদের পরস্পরের লোভটা কারো অজানা নয়। ওরা তক্কে তক্কে থাকে, কাউকে বিশ্বাস করে না।

কয়েক ভাড় খেলেই নেশা জমে ওঠে, দিল খুলে যায়। তখন গুড় গুড় করে পেটের ভেতর থেকে গোমড় কথা সব বেরিয়ে আসে। কিন্তু কেউ না কেউ একজন সচেতন থাকেই, দাবড়ে ওঠে, খিস্তি করে, কোঁৎকা মারে পাঁজরে। বেসামাল মাতাল তখন সামাল দিতে ব্যস্ত হয়ে ওঠে। অন্যরা দাঁত বার করে হি হি করে হাসে, দু'চারটে অশ্লীল সম্বোধন ছুঁড়ে মারে মুখে।

আজও নেশাটা জমে উঠতেই কানাই ফ্যাঁ ফ্যাঁ করে হেসে উঠে ফিস্ ফিস্ করে বলে—কাল রাতের দাঁওটা বেশ ভালই হয়েছে, কি বলিস্।—বলেই হিক্কা তুলে ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে অন্ধকারের দিকে চায়।

—বেটা মাতাল হয়েছে রে অটলা।

—দুর্ সম্বন্ধীর পো, কানাই তেমন মাল আর কি? দু'হাঁড়ি সাবড়াতে পারি এক চুমুকে।

—মাত্তর! ফুঃ। মোটে দু'হাঁড়ি। ছেঃ ছেঃ, শালার যা গতরই আছে, কাজের বেলায় ঠন্‌ঠন্। বুঝলি কানাই, তিন হাঁড়ি আমার কাছে এক গেলাস জলের মত। গলায় দিলাম কি নেই।

অটল তার কোমরে রশি আঁটতে আঁটতে বলে—রোয়াবী রাখ শালা। দু'ভাড় খেয়েই তো পেচ্ছাপ করে দিস্।

কানাই দরজা দিয়ে তীক্ষ্ণ চোখে অন্ধকারের দিকে চেয়ে বলে—নদীর দিকে কে যাচ্ছে রে?

দুলে, অটল ঝুঁকে পড়ে বলে—কে? কে যাচ্ছে?

কানাই সাপের মত হিস্ হিস্ করে হেসে উঠে বলে—দূর্ শালা, অন্ধকারে এত দূর থেকে দেখা যায় নাকি কিছু। হ্যাঁরে, অটলা, তুই সন্ধ্যার পর নদীর ধারের জঙ্গলে এত ঘুর ঘুর্ করিস্ কেন রে? সুন্দরীর গায়ে হাত দিবি তো খুন করে ফেলব?

—ওরে আমার সুন্দরীর বাপের জন্মের স্বোয়ামী এলেন রে। আমার হক্ তোর চাইতে কম কিসে। তোর গতর আছে, আমি লিখতে পড়তে জানি। তোর চাইতে দেখতেও আমি ভাল। কিরে, দুলে শালা বল না; ঠিক বলেছি কিনা?

—হারামীর বেটা কার্তিক সাজতে চায় রে দুলে। আমি সুন্দরীকে হার গড়িয়ে দেব। তুই পারবি?

—আমি বাজু গড়িয়ে দেব। তুই পারবি?

দুলে খেঁক্‌শিয়ালের মত হেসে উঠে বলে—তুই শালারই মাথা খারাপ হয়ে গেছে। সামনে গিয়ে বল না দেখি মুরোদ কত। ওই তো একরত্তি মেয়ে। ছুঁড়ির সামনে গিয়ে তো ছুঁচোর মত চিঁ চিঁ করিস্।

—ভদ্দরলোক হয়ে উঠছে যেরে। মাষ্টারবাবুর বউ ভালবাসে।

—আমরা ভদ্দরলোক নই বুঝি? ভদ্দরলোক কি আর গায়ে লেখা থাকে; ওই শালার কেরানি বাবুরা আমাদের চাইতে বেশী কামায় নাকি? ফুঃ। বাগে পেলে ওই ছুঁড়ীর বিষ দাঁত ভেঙে দেব না?

উপেনের আস্তানায় তখন দোতারাতে সুর তুলে নন্দ গাইছে—

এ সুখের দিন কয় দিন রবে
মন তোমার।
ও মন ভাবছো বা কি ডাকল ফাঁকি
সুদিনে আঁখি অন্ধকার।

দরাজ জোয়ারী ভরা গলা। কোথাও আঁশ নেই। ও গলায় সুর আর মাধুর্য যেন আপনা থেকে নেচে ওঠে। প্রতিটি বাণী স্পষ্ট। সুর পেয়ে কথাগুলো যেন অর্থময় হয়ে উঠে শ্রোতার অন্তরে ঘা' মারে। মোহগ্রস্ত মন কেমন উদাস হয়ে যায়। কি হবে! কি হবে! চোখ বুজিয়ে বসে রইলাম যে? এদিকে সুখের দিন আর কয়দিন হায়! হায়! মন এ তোমার কি কারবার।

—অটলা, উপেনের ডেরাতে গান গাইছে না কেউ?

গানের সুর বুঝি তাদের অন্তরও স্পর্শ করেছিল। অর্গল খুলতে না পারুক, পচা দুর্গন্ধময় হাওয়াটা বুঝি সাব করে দিতে পেরেছিল?

—শালা বেড়ে গাইছে তো। খাসা গলা—ভুলে বলে।

—সেদিন যে বাজারে গাইছিল, সে বেটাই নাকি?

—কে জানে কোন বেটা, নেশাটাকে দিলে বারটা বাজিয়ে। ওদিক থেকে তখন গানের কলি ভেসে আসছে—

দিন দুই চারি পরের ঘরে
ঘুরে মরি মায়ার ঘোরে,
ভুলে পরে যারে তারে,
বলতে দিস্ আমার আমার।

নন্দর গানে কি ছিল কে জানে, কানাই মান্না রক্ত চক্ষু মেলে একটু সময় স্তব্ধ হয়ে থেকে 'ছুর্ শালা' বলে উঠে বাইরে অন্ধকারে টলতে টলতে বেরিয়ে যায়। নদীর ধারে গেল কি কোন এক আস্তানার পাশে ওৎ পেতে থাকে ভুলে আর অটল তা খেয়াল করে না। ওরা কান পেতে গান শোনে, বেড়ে গায়। ওরা হয়তো মনে

মনে ভাবে একটু যদি গাইতে পারতো? একটু যদি লেখাপড়া জানতো? কিংবা যদি জানতো কোন হাতের কাজ হয়তো আলোর সামনে দাঁড়াতে পারতো সাহস করে। হয়তো পারতো এই মাঠের জীবনটাকে পেছনে ফেলে এগিয়ে যেতে। কোন কালে এক অন্ধকার অমাবস্যার সুরঙ্গ দিয়ে ওদের জীবন ভূমিষ্ঠ হয়েছিল, সেই অন্ধকার আর তাদের ছেড়ে গেল না? দিনের পর দিন অন্ধকার বাড়ছে, কালিতে লেপ্টে যাচ্ছে আরও বেশী করে। দুর্—বরবাদ সব বরবাদ। কালিতে কালিতে বরবাদ হয়ে গেল জীবনটা। এখন আর কোথাও আলো নেই, আশা নেই, জীবনের সবকিছুই যেন কেমন নিরাকার হয়ে গেছে। এখন নিশব্দে আর অজ্ঞাতে যে কাজ করে যায় সে এক উদগ্র বুভুক্ষার মন, এক প্রকট দ্বন্দ্বহীন জান্তবতা।

দূর থেকে দেখেই হাঁক পাড়ে সুন্দরী—ও শশীদা, আমার জিনিস দুটো আনলে নাকি গো!

শশী কাছে এসে কাঁচুমাঁচু করে বলে—সুন্দরী মনটা ভাল নেই রে। রোজগার পাতি আজ খুব খারাপ। কাল ঠিক আনব দেখিস্। কি যেন বলেছিলি, পাউডার আর সুগন্ধি তেল, তাই না?

—হাঁ, কাল যেন ভুলে যেও না শশীদা।

শশী বাউড়ী গায়ে গতরে খেটে খাওয়া মানুষ। দৃষ্টি এদিক ওদিক নয়, সরল চোখে সোজা পথ চেয়ে চলে। বউ ছেলেপুলের জন্য দিন-রাত্রি রোজগারের ধান্দায় থাকতে সে কিছুমাত্র ক্লান্তি বোধ করে না। শশী কখনো রাস্তায় রাস্তায় কাগজ, এটা সেটা কুড়িয়ে কুড়িয়ে বেড়ায়। কখনো বাড়ি বাড়ি গিয়ে পুরানো কাগজ কম দামে সংগ্রহ করে এনে লাভ রেখে বিক্রী করে বাজারে। শশীর বউ চারু রেল কোয়ার্টার্সে ঘর গেরস্থালীর ঠিকে কাজ করে। তিনটে ছেলেমেয়ে নিয়ে কষ্টে সৃষ্টে শশীর সংসার ধুকতে ধুকতে চলে যায় কোন রকমে।

রাতের দিকে শশী বসে বিড়ি ফুক্‌ছিল আর মাঝে মাঝে দু' একবার খক্‌ খক্‌ করে কাশছিল। ছোট একটা কেরোসিনের কুপী জ্বলছে ঘরের এক কোণে। ম্লান আলোতে শশীর পাকানো দড়কচা মারা কুচ্‌কুচে রং-এর শরীরে একটা প্রেতায়িত আবহাওয়া হিল্‌ হিল্‌ করছিল! শশী ভাবছিল কাল কাগজ কুড়াতে বেরোবে না পুরানো খবরের কাগজ সংগ্রহ করবে?

শশীর পাশেই শুয়ে শুয়ে চারু কোলের ছেলেটিকে মাই দিচ্ছিল। শশী তার পাছায় একটা ঠেলা মেরে বলে--কিরে, ঘুমুলি নাকি?

—-না, কি বলছ বলো।

—তোর বাবুরা নাকি বদলী হয়ে যাচ্ছে।

—হ্যাঁ।

—আর কোথাও কাজ ঠিক করলি নাকি?

—মালবাবু তো খুব খোশামোদ করছে।

—হুঃ তুই গলে গেছিস নাকি? বেটা হারমাদ আছে। বউ আনে না, নষ্টামী করে বেড়ায় এখানে সেখানে। খবরদার. তুই কিন্তু ওখানে কাজ নিবি না। হ্যাঁরে, সুন্দরী যে বলেছিল টিকিট বাবুদের সর্দার তোকে দেখা করতে বলেছিল?

—কাল যাব একবার।

ছেলেটা ঘুমিয়ে পড়তেই চারু এবার ছেলের মুখ থেকে ঝিমিয়ে পড়া মাইটা সরিয়ে নিয়ে উঠে বসে। রাত্রিবেলা ঘরের ভেতরে স্বোয়ামীর কাছে বসে আছে বলেই বোধ হয় আর আঁচল টেনে বুক ঢাকবার খুব একটা প্রয়োজন দেখে না সে। ঠিক থলথলে নয়, কেমন যেন ঝল্‌ঝলে শরীর চারুর। মাংসের সঙ্গে স্বোয়াস্তির লাবণ্য মিশলে যেমন দেখায় তেমন অনেকটা। চারুর মনে হয় তার বুকের ভেতরে বেশ একটা সুখ সুখ ভাব আছে। শশীর কোন বদ খেয়াল নেই, শশী তাকে ভালবাসে। ছেলেপুলেদের যত্ন আত্তি করে। তাতেই নিজেকে চারুর খুব সুখী সুখী মনে হয়।

নন্দর গানের সুর অনেকক্ষণ থেকেই একটু একটু তাদের কানে আসছিল। চারু শশীর মুখের দিকে চেয়ে বলে—নন্দ গায়েনের গান শুনলে মনটা কেমন করে গো।

—ওই যে নন্দ গায় 'ধান পাকে ধান পাকে' শুনে তোর গাঁয়ের কথা মনে পড়ে নারে চারু।

—কান্না পায় গো। বুক চাপড়াতে ইচ্ছা করে। ওগো, ভগবান আমাদের এমন কেন করলে গো।

ভগবান কেন এমন করলেন, করে কার উদ্দেশ্যই বা সিদ্ধ করলেন এসব শশী বোঝে না। সে বোঝে এগুলো তাদের অদৃষ্ট। গরীবের অদৃষ্ট নিয়ে ভগবান ছিনিমিনি খেলতে ভালবাসেন।

—তুই শুয়ে পড় চারু, আমি একটু গান শুনে আসি।

চারু যেন সোহাগী হয়ে ওঠে, বলে—হ্যাঁ গো আমি একবার যাব না। ওই যে রাধা-কেষ্টর গানই তো গাইছে।

শশী বিড়িটা ছুড়ে ফেলে দিয়ে বলে—আচ্ছা, তা হলে তুই যা চারু, খানিকটা শুনে আয়। তুই ফিরে এলে না হয় আমি যাব।

চারু ছেলেমেয়েগুলোর দিকে একবার দেখে ঝাঁপটা খুলে অন্ধকারে বেরিয়ে যায়। শশী নূতন করে আর একটা বিড়ি ধরিয়ে সাঁই সাঁই করে দুটো মোক্ষম টান্ মেরে শিবনেত্র হয়ে ধূম উদ্গীরণ করতে করতে ভাবতে থাকে—কাল বাড়ি বাড়ি গিয়ে পুরানো খবরের কাগজই সংগ্রহ করবে সে। মহাজনের কাছ থেকে বাকী পয়সা গুলো যেমন করে হোক আদায় করবে। পূজা এসে যাচ্ছে, চারুকে ভাল দেখে একটা ডুরে শাড়ি আর চকচকে একটা পাটের জামা কিনে দিতে হবে। চারু খুশীতে ডগমগ হয়ে উঠবে আর সেই খুশীতে শশীকে ছিঁড়ে খুঁড়ে একশা' করবে। শশী ভাবে তিন ছেলেপুলের মা চারুকে সে ভালবাসে। চারু স্বামী সোহাগিনী। তার মনে কোন নষ্টামী নেই। পরিবেশের বিষ ওকে একটুক হাত করতে পারেনি? চারুই সকলকে দু'চার কথা শুনিয়ে দিতে পারে,

দেয়ও। তাই যেন সুন্দরীকেও ভালবাসে স্নেহ করে চারু। শশীও করে। সনাতনের পাশের গাঁয়েই বাড়ি ছিল শশীর। এই বিদেশ বিভূঁয়ে তাই আপন জন মনে হয় পরস্পরকে।

চারু মাঝে মাঝে বলে—গোবরে পদ্মফুল গো। মেয়েটাকে ঠাকুর এই আস্তাকুঁড়ে এনে ফেলল কেন বল দিকিন।

শশী ঝিমুতে ঝিমুতে ভাবে : কাল আস্তাকুঁড় ঘেটে ঘেটে কাগজ কুড়োবে, না, পুরানো কাগজ সংগ্রহ করবে। পুরানো কাগজের দাম বেড়ে যেতে পারে। কিছু কিনে রাখতে পারলে হতো এই সময়। কিন্তু কিছু কিনে রাখবে সে সম্বল কোথায়? শশীর যে টেনে আনতে গেলে ছিড়ে যায়। দাম বাড়লে কমলে লাভ কি শশীর।

তখন রেলওয়ে কোয়ার্টাসে একটি মানুষ দরদের সঙ্গে লিখে চলেছেন: হ্যাঁ, সব জিনিসেরই দাম বাড়তে পারার পথ খোলা আছে। কিন্তু শশীদের দাম এই পৃথিবীতে আর কখনো বাড়বে কিনা কেউ জানে না। শশীরা মানুষের ছদ্মবেশে একটা বিশেষ জীবমাত্র। জীব মাত্রই বাঁচতে চায়। কিন্তু ওদের বাঁচতে না দেবার দায় অনেকের হলেও বাঁচতে দেবার দায় কারো নয় পৃথিবীতে। ওরা এসেছে সুখী সমাজের অলক্ষ্যে চলেও যাবে তাই। মানুষের জয়যাত্রার পথে ওদের সরব স্বাক্ষর কবে কোথায় উৎকীর্ণ হয়েছে? তাই তো ওরা অর্থহীন, সমাজের জঞ্জাল? ওদের জন্য শিক্ষিত, সভ্য সমাজের অন্তর ব্যথিত হবে এমন কথা ভাল শোনায় না।

হরেকৃষ্ণ দাস কবে থেকে যে হরেকেষ্টতে এসে দাঁড়িয়েছে সে খবর হরেকেষ্ট নিজেও রাখেনি। তার খিট্‌খিটে অসহিষ্ণু মেজাজের জন্য অনেকেই বিরক্ত হয়ে বলে হরেকেষ্টা। এক সময় কারখানায় কাজ করতে গিয়ে হাতের তিনটে আঙ্গুল খুইয়ে কারখানা ছেড়েছে হরেকেষ্ট। জন্ম কানা হরেকেষ্ট ছেলেবেলা থেকেই শুনে আসছে কানা হরে। ফলে অঙ্কুরোদ্গম থেকেই একটা অসন্তোষ বুকের

ভেতরে দানা বেঁধে বেঁধে বিরক্তিকর স্বভাবে দাঁড়িয়েছে এখন। কোথাও বনিবনা করে টিকতে পারেনি হরেকেষ্ট আজও। বউ বিন্দীর সঙ্গেও তার বনিবনা নেই। মাসের মধ্যে সাতাশ দিনই পরস্পরের মধ্যে গজ-কচ্ছপের যুদ্ধ চলে। খিস্তি খেউরে দু'জনই সমান ওস্তাদ, বেহেড নির্লজ্জ।

হরেকেষ্ট কাজ থেকে ফিরছিল চাবির গোছা ঝন্‌ঝনিয়ে; উপেন ঘরের দরজা থেকে ডেকে বলে—হরেকেষ্ট ফিরচ নাকি? এসো একটু চা খাও। তার পর দেখো দেখি আমার তালাটা বেগোরবাই করছে কেন?

—ধুস্—মুখে অস্ফুট একটা বিরক্তিকর শব্দ করেও হরেকেষ্ট এসে বসে। —তা গায়েন কোথায় উপেন?

—এখনো ফেরেনি। দেখো দেখি তালাটা।

হরেকেষ্ট তালাটা দেখতে দেখতে বলে—ছেলেটা—বেড়ে গায়, কি বল উপেন। বিন্দী তো রোজই আসে দেখি।

—কোথায় হে বিন্দীকে তো দেখি না।

—তা হলে মাগী অন্য গান শুনতে যায়। হরেকেষ্ট কেন জানি গোঁজ হয়ে যায়। একটা গোঁয়ারের মত মুখ করে আর ঠকাস্ ঠকাস করে তালা ঠিক করতে থাকে।—বুঝলে উপেন, বজ্জাত, একবারে হারামী। মাগীকে তুলো ধুনো করতে ইচ্ছে করে এক একদিন।

উপেন মুখ ফিরিয়ে হাসি চাপা দিতে চেষ্টা করে।

তালা ঠিক করে দিয়ে চা খেয়ে নিজের ডেরায় চলে আসে হরেকেষ্ট। মুখটা গোঁজ করেই থাকে—যেন মনে মনে ফুঁসছে হরেকেষ্ট কিন্তু কি করবে কিছুই ভেবে পাচ্ছে না। বিন্দী তখন রান্নার তোড়জোড় করছে বসে বসে। সারাদিন পর হরেকেষ্ট গতর খাটিয়ে এসেছে দেখেও সেদিকে বিন্দুমাত্র ভ্রূক্ষেপ নেই বিন্দীর। যেন মানুষই নয়, কোনই সম্পর্ক নেই তার সঙ্গে।

হাড় জির্জিরে হরেকেষ্টর শরীরের ভেতর যেন আগুন ধরে যায়। একটা জিংলা-পোড়া সাপের মতই চিরিৎ করে লাফ দিয়ে গিয়ে বিন্দীকে এক হেঁচ্‌কা টান মেরে মাটিতে ফেলে দিয়ে বুকে চেপে বসতে চেষ্টা করে হরেকেষ্ট। চোখ দুটিতে যেন ড্রাগনের চোখের মতই আগুনের হল্কা বেরোয়।

—মিনসের মাথা খারাপ হয়ে গেল নাকি?—বলে দু'ঝট্‌কায় হরেকেষ্টকে সরিয়ে দিয়ে উঠে বসতে চায় বিন্দী। টানাটানি আর ধস্তাধস্তিতে বিন্দী হয়ে গেছে বিস্রস্ত, হরেকেষ্ট হাঁপাচ্ছে একটা হাপরের মত। বিন্দী যেন বুঝতে পারে এবার, হরেকেষ্ট কি চাইছে। ঢেমনার রকম দেখো, বলে নিজেই তার সুযোগ সুবিধা করে দেয়। ম্লান অন্ধকার ঘরে হরেকেষ্ট তার প্রতিহিংসা চরিতার্থ করার বাসনায় ক্ষিপ্ত হয়ে উঠতে থাকে।

রাতে খাওয়ার সময় কি একটা কথা নিয়ে আবার এক প্রস্থ মুখবাজি হয়ে যায় ওদের মধ্যে। তার পর অবশ্য বাতি নিবিয়ে এক সময় শুয়ে পড়েছে। হরেকেষ্ট অন্ধকারে হাত্‌রে হাত্‌রে সোহাগের আলো জ্বালতে চেয়েছিল কয়েকবার। কিন্তু বিন্দীর হাত-পা ছোঁড়া দেখে কাছ ঘেঁষতে সাহস করেনি। হরেকেষ্ট অসহায় পৌরুষ নিয়ে ধুক্‌তে ধুক্‌তে আর তীক্ষ্ণ চোখে বিন্দীকে লক্ষ্য করতে করতে ভাবে—হারামজাদীর শরীরে ভগবান যেন কয়েক লাখ চড়ুই পাখীর বাসা করে দিয়েছে। কেবলই ছুক্‌ছুক্ করছে ছিনালী।

আজও উপেনের ডেরায় গানের আসর বসেছে। নন্দর গলা তখন গম গম্ করে উঠছে অন্ধকারে। বিন্দী অনেকক্ষণ পাথরের মত অনড় হয়ে শুয়ে থেকে হঠাৎ একসময় ছট্-ফট্ করে উঠে বসে। অন্ধকারে হরেকেষ্টকে একবার দেখে নিয়ে উঠে দাঁড়ায়।

—কোথায় যাচ্ছিস্? হরেকেষ্টও উঠে বসে।

—কোথায় আবার? গান শুনে আসি একটু।

—না নষ্টামি করতে যাচ্ছিস্?

—ওরে মিনসে, স্বোয়ামীগিরি ফলাচ্ছিস্ নাকি ?

—বাইরে বেরুবি তো তোর ঠ্যাং ভাঙৰ বলে দিচ্ছি ?

বিন্দী ঝংকার দিয়ে ওঠে, কথার সুরে বিষ মিশিয়ে বলে—থাম্, তোর মুরোদ দেখা আছে। ভাত দেবার ভাতার নয়—নাক্ কাটবার গোঁসাই। আমি কি তোর বিয়ে করা বউরে কানা, যে ধমকাচ্ছিস ? বাপ-মা খেতে দিতে পারছিল না বলেই না তোর মত একটা ছুঁচোর সঙ্গে পালিয়ে এসেছিলাম ? নইলে তুই আমার নখের যোগ্যি নাকি ?

হরেকেষ্টরও স্বর চড়তে থাকে ক্রমশঃ। বলে—আমি এনেছিলাম বলেই তো দু'বেলা খেয়ে খেয়ে গতর তৈরী করতে পেরেছিলি বেইমানী।

—তোকেও দু'বেলা রান্না করে খাওয়াই নাবে বুড়ো ঢেমনা, দু'বেলা হাত পুড়িয়ে খা না, দেখি এত তেজ কোথায় থাকে ? মাগ্ না বউ পেয়ে ধরাকে সরা জ্ঞান করছিস্, নারে মিনসে ?

হরেকেষ্ট রাগে আক্রোশে তো তো করতে করতে বলে—আমার খাবি পড়বি, আর মজা লুঠবে অন্য লোকে ?

—সে পয়সায় ভাল মন্দ তুই খাস্‌না ? তখন তো নোলায় জল আসে। বাপের জন্মে খেয়েছিস্ এমন ?

হরেকেষ্ট এবার চুপ করে যায়। বিন্দীর সঙ্গে সে কখনোই কথায় পেরে ওঠে না যদিও তবু স্বভাবের দোষেই মুখবাজি করে যেতে থাকে কখনো কখনো। হরেকেষ্ট না পারে বিন্দীর পেটের ক্ষুধা মেটাতে, না পারে দেহ, মনের সাধ মিটিয়ে তৃপ্তি এনে দিতে। বিন্দীর ইচ্ছা শক্তি আর সামর্থ্যের কাছে হরেকেষ্ট যেন একটা তেলা পোকা। পিঠের উপর শুয়ে দিলে হাত-পা ছোড়ে, বুকের উপর চেপে ধরলে একমুহূর্তে হেদিয়ে যায়। হরেকেষ্ট বোঝে বিন্দী ওকে করুণা করেই রান্না করে খাওয়ায়, ময়লা ছেঁড়া বিছানায় পাশাপাশি শোয়। বিন্দীর স্বৈরিণী প্রবৃত্তিকে হরেকেষ্ট প্রথম থেকে বুঝতে

পেরেছিল, কিন্তু তার অকৃতার্থ পৌরুষ শুধুমাত্র ওইটুকুর লোভে সব জেনে বুঝে ও বেশীর ভাগ সময় নির্বাক হয়ে থাকে। হরেকেষ্টর বয়স চল্লিশ পেরিয়ে গেছে। বিন্দীর বয়স পঁচিশ। বিন্দী ওকে ব্যঙ্গ করে বুড়ো চেম্‌না বলবে না তো কে আর বলবে? ভগবানই হরেকেষ্টর জন্মলগ্ন থেকে মস্করা করছে, বিন্দীর আর দোষ কি?

বিন্দী বাইরের অন্ধকারে এসে দাঁড়ায়। চারিপাশে অন্ধকার থম্‌থম্‌ করলেও বিন্দীর চোখ বিড়ালের চোখের মতই জ্বলে অন্ধকারে। একটা বিষাক্ত সরীসৃপের মত হিল্‌ হিল্‌ করে অন্ধকার কেটে কেটে যেন আরও কোন গভীর অন্ধকারে লোভের নেশায় এগিয়ে যায় সে।

বিন্দী জানে এ নেশা তার রক্তের ভেতর জড়িয়ে ছড়িয়ে তাকে আষ্টে-পৃষ্টে বন্দী করে রেখেছে। এই নেশা থেকে তার মুক্তি নেই। এই নেশা তাকে ঘরছাড়া করেছে, এই নেশা তাকে নিশাচরী করেছে। হয়তো এই নেশা তাকে আরও এক গভীর সর্বনাশের দিকে টেনে নিয়ে যাবে। মাঝে মাঝে খুব কষ্ট হয় বিন্দীর। মরে যেতে ইচ্ছা করে সে মুহূর্তে। নেকড়েগুলো মত্ত হাতির মত ঘণ্টার পর ঘণ্টা বুকের উপর চেপে বসে থাকে, সমস্ত শরীর একটু একটু করে খুবলে খুবলে খায়। বিন্দীর শ্বাস ফেলতে কষ্ট হয়। মনে হয় এক্ষুনি দম আটকে মরে যাবে সে? সমস্ত রক্তে বৃশ্চিক দংশনের মত একটা তীব্র জ্বালা জ্বলতে থাকে। ক্রমশঃ সে ভার পাহাড়ের মত হয়ে ওঠে। কষ্ট, অসীম অনন্ত, অসহ্য কষ্ট। বিন্দী চোখের জলের সঙ্গে মনে মনে প্রতিজ্ঞা করে—আর নয়! আর নয়! ভগবান বাঁচাও। কিন্তু দিন পাঁচ-ছয় পর আবার নিশাচরী বৃত্তি বিন্দীর রক্তের মধ্যে দোলা দিতে থাকে। তাকে উন্মাদ করে তোলে। বিগত দিনের কথা আর বিন্দীর মনে থাকে না।

বিন্দী নিশাচর শ্বাপদের মতই চলেছিল, আচম্‌কা অন্ধকার গাছের আড়াল থেকে ছুটো সরীসৃপ লক্‌লকে অগ্নিজিহ্বা নিয়ে এসে জড়িয়ে

ধরে তাকে। এক ঝলক চমকে ওঠে অবশ্য বিন্দী কিন্তু ভয় পায় না। মনে হয় এমন ঘটনা আর অভ্যর্থনার সঙ্গে তার অপরিচয় নেই।

কানাই মান্না জড়িয়ে জড়িয়ে বলে—কোথায় যাচ্ছিস! অট্লার ডেরায়?

—যেখানেই যাই, তোমার তাতে কি? ছাড়ো—

—অট্লার জন্য খুব দরদ দেখছি দেখি তোর।

—তোমার জন্যও কম দরদ ছিল নাকি নাগর? তা তোমাকে ভীমরতি ধরেছে, নর্দমায় বাস করে স্বর্গের দিকে হাত বাড়াও।

—কি বললি! নর্দমায় বাস করি আমি? জানিস্ ইচ্ছা করলেই আমি ঘর-বাড়ি তৈরী করতে পারি।

—যাও, যাও আর রোয়াবী করতে হবে না। বিন্দী নিজেকে কানাই মান্নার আকৃসি থেকে ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টা করে একবার। বলে—যেদিন ধরা পড়বে, সেদিন বুঝবে কত ধানে কত চাল।

কানাই মান্নার নেশা ছুটে যাবার উপক্রম হয়, বলে—বিন্দী আবার বলবি তো, তোর জিব উপরে ফেলব?

বিন্দী বিরক্ত হয়ে এক ঝাট্কায় নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে হন্ হন্ করে অন্ধকারে চলতে থাকে। শিকার পালিয়ে যাবার সময় শিকারী যেমন হন্যে হয়ে ওঠে; কানাই মান্না তেমনি মুহূর্তে এক লাফে এগিয়ে এসে জাপটে ধরে বিন্দীকে।

বিন্দী কিন্তু প্রতিরোধের বিন্দুমাত্র আতিশয্য প্রকাশ করে না। শুধু বিরক্ত কণ্ঠে বলে—ছাড়ো বলছি মান্না।

কানাই মান্নার কণ্ঠে ক্ষুধার্তের চীৎকার হিস্ হিস্ করে ওঠে—ঘরে চল্ বিন্দী।

—ঘরে নিয়ে যাবে তো এত আজে বাজে কথা বলছিলে কেন?

—অটলার কাছে যাবি না।

—তুমি তো অটলার গুরু।—

বিন্দী স্থির নিশানায় কানাই-এর ট্যাক হাতড়াতে থাকে। এই

সব বন-শূয়ারের দলকে বিশ্বাস নেই। বিন্দী জানে তার রক্তে দোষ আছে। রক্তদোষে তার শান্তি নেই স্বস্তি নেই। শুধু দুটি ভাল-মন্দ খেতে পরতে পারা ছাড়া তার জীবনে আর কোন উদ্দেশ্য নেই, ভবিষ্যৎ নেই। অটলা বলেছিল তার ডেরায় গিয়ে বউ হয়ে থাকতে। অটলা তো আর হরেকেষ্ট নয়। সে কি আর বিন্দীর রক্তদোষকে রেয়াৎ করবে! তাছাড়া একদিন না একদিন বেঘোরে মারা পড়বে অটলাদের দল। আবার একটা আশ্রয় খুঁজতে হবে বিন্দীকে। না, এই ভাল।

কিন্তু এই চলমান জীবনটাই বা ভাল কোথায়? ওই জানোয়ার গুলো যে কত পাশবিক তা না দেখলে তো আর কেউ বিশ্বাস করতে পারবে না? বিন্দীর মিনতি আর কষ্ট যেন ওদের এক নিষ্ঠুর সুখে পুলকিত করে তোলে। যখন জানোয়ারটা শান্ত হবে তখন বিন্দীর শরীরের রক্ত জল হয়ে এসেছে। সমস্ত শরীরে জ্বালা পোঁড়া, হাঁটু দুটি শক্তি হীন, সমস্ত অস্তিত্বটাই যেন লণ্ডভণ্ড হয়ে গেছে। স্বৈরিণীর সুখ আর যন্ত্রণা নিয়ে বিন্দী ঘরে ফিরে আসে। হরেকেষ্ট কুটিল চোখে চেয়ে চেয়ে খুসী হয়। কখনো ইচ্ছা করে বিন্দীর মুখে একটা লাথি কসিয়ে দিয়ে আরও খুসী হয়। আর কখনো বিন্দীর সেই এলোমেলো মৃতপ্রায় দেহটাকে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে এক জঘন্য প্রতিহিংসা চরিতার্থ করতে চায় হরেকেষ্ট। নিরুপায় বিন্দী শুধু জ্বলন্ত চোখে চেয়ে চেয়ে দেখে আর দম বন্ধ করে; হাত মুঠি করে মৃত্যুদীর্ণ হতে থাকে।

কথাটা নন্দ বার বার ভেবেছিল, কোন রকমে রাতটা কাটলেই শহর ছেড়ে সট্‌কে যাবে সে। তার পর একদিন দু'দিন করে অনেক দিন কেটে যায় কিন্তু ঠিক বিকালে কিংবা সন্ধ্যায় উপেনের ডেড়াতে ফিরেই আসে নন্দ। মাঠটা এই কয়েকদিনে যেন কিছুটা গা' সহা হয়ে গেছে তার। এখন আর ততটা ঘিন্ ঘিন্ করে না। মাঠের অনেকেই নন্দর গুণের জন্য কেমন যেন খানিকটা দরদ দেখায়,

দু'চারটে কথাবার্তা হয় দেখা সাক্ষাৎ হলে। শুধু ওইটুকুই। রুজি রোজগারের ধান্ধায় ব্যস্ত মানুষগুলো পরস্পরের প্রতি এর বেশী আর অন্তরঙ্গ হয়ে উঠতে পারে না। সময় নেই, অবসর নেই তাই বুঝি মনও নেই।

রোদ তেঁতে উঠবার আগে বেরোয় নন্দ আর ফিরে আসে সন্ধ্যায়। নদীতে স্নান-টান সেরে ডেরাতে ফিরে এলেই তো স্বর্গে না নরকে আছে সে কথা না ভাবলেও চলে। কিন্তু ঘরে বসে অনেক কিছুই ভাবে নন্দ। বুঝতে পারে দু'-একটা নূতন স্বাদ-আহ্লাদ তার মনে জন্ম নিয়েছে। সেগুলো মনের ভেতরে নড়ে চড়ে কুট্‌স্-কুট্‌স্ দাঁত কাটে, শরীরের রক্তে বুড়-বুড়িয়ে চলাফেরা করে। যেন এই নূতন স্বাদ-আহ্লাদগুলো নন্দকে এই মাঠের আশ্রয় ছেড়ে কোথাও যেতে দিচ্ছে না!

উপেন মাঝে মাঝে বলে—তুমি কি ভাব গো গায়েন ?

নন্দ ধরা পড়বার আশঙ্কায় সিট্‌কে গিয়ে বলে—কই কিছু তো ভাবি না উপেনদা।

—বুঝি গায়েন বুঝি। তোমার এখানে ভাল লাগছে না। শুধু আমার জন্যই তুমি চলে যেতে পারছ না। তুমি হলে গুণী মানুষ; তোমার এখানে ভাল লাগবে কেন ?

নন্দ একটা স্বস্তির নিশ্বাস চেপে হেসে বলে—দূর্, তুমি ভুল ভাবছ উপেনদা। আমার যেতে ইচ্ছা করছে না। আর গেলে তোমাকেও সঙ্গে নিয়ে যাব। তুমি রোজগার নাই বা করলে? আমার রোজগারেই দেখবে মোটা ডাল ভাত হয়ে যাবে।

এককালের দুর্দান্ত সমাজ-বিরোধী উপেনের চোখ-মুখ যেন সজল হয়ে আসে। বলে—গায়েন ঠাট্টা করছ বুঝি? এদিনে কেউ কাউকে ফোকটে খাওয়ায় নাকি ?

—তা আমি কি করে জানব? আমার যা মনে হয়েছিল তোমাকে বললাম। দেখি সয়োতো ভাতটা উনুন থেকে নামাই।

—হাঁড়ি আমি নামাতে পারব। কচুর শাক এনেছি। সেদিন যে রেঁধেছিলে সেরকম রাঁধবে নাকি আজ গায়েন? বেড়ে হয়েছিল।

নন্দ হেসে বলে—তা রাঁধব। আচ্ছা উপেনদা, তুমি বিয়ে করোনি কেন?

উপেন তার কাটা পা খানার দিকে একবার চেয়ে বলে—সে অনেক কথা গায়েন, পরে শুনবে। আমি কল থেকে জল নিয়ে আসি, তার পর ধীরে সুস্থে রান্না চড়ানো যাবে।

উপেন চলে যেতেই নন্দ চুপচাপ বসে বসে অনেক কথা ভাবতে থাকে? বেচারা! একটা পা' না থাকলে মানুষের আর থাকে কি? তা পা' থাকলে কি আর উপেনের এই মন থাকতো না প্রাণটা এমন কোমল নরম হয়ে উঠতো? একটু একটু শুনেছে সে, কি দুর্দান্ত লোক ছিল উপেন? নিজের মনের সঙ্গে না বন্‌লে ঠাস্ করে মাথায় লাঠি বসিয়ে দিতে এতটুকু ভাবতো না সে। পালাতে গিয়ে ট্রেনের নিচে না পড়লে কি আর ভগবান তাকে হাত ধরে টানতো এমন? নন্দ বোঝে, উপেন কেন জানি ওকে ভালবেসে ফেলেছে, নিজেরই আশা-আকাঙ্ক্ষার সঙ্গী করে নিয়েছে। নন্দ চলে যেতে চাইলে, শুধু গান শুনতে পাবে না এটাই ক্ষতি নয়, উপেনের নাড়ীর ভেতর ও কোথায় যেন টান্ পড়বে বলে মনে হয় নন্দর। স্নেহ! ওই যে বলে অপত্যস্নেহ তাই বোধ করি হয়েছে উপেনের।

সুখনরাম মাঝে মাঝে সন্ধ্যার দিকে তার জিনিসপত্র নিয়ে গঞ্জের বাজারে গিয়ে বসে। যেতে যেতে সেদিন নন্দকে চুপচাপ বসে থাকতে দেখে বলে—আরে বেটা নন্দ, কেয়া করছ তুমি। মন ভাল না আছে?

নন্দ চোখ তুলে একটু হাসে।

সুখনরাম দরজার কাছে ইটের পাঁজাটার উপর বসে বলে—বেটা, বাজার বহুৎ মন্দা আছে। ভুখা থাকবার দিন আতা হায়। আমি কি করবে, বুড্ডা হয়ে গেছি।

—সুখনজী, আপকো গানা শুনতে হবে। উপেনদা বলেছে, আপ তো বহুৎ বড়িয়া ভজন গানেওয়ালা হ্যায়।

সুখনরামের কোটরগত নিষ্প্রভ চোখ দুটি উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। যেন বিগত জীবনের একটা ব্যর্থ বিশ্বাস হঠাৎ প্রাণ ফিরে পায়। হায়! হায়। সেদিন কি আর আছে? একদিন গান গেয়ে গেয়ে নিজে আনন্দ পেয়েছে, কত লোককে আনন্দ দিয়েছে। আজ গলা চড়ে না, স্বর ভেঙে যায়; ভেতরের প্রাণটা রুদ্ধ আবেগে চিঁ চিঁ করে। আজ বিগত কালের গৌরবের কথা শুনলে একটু সময়ের জন্য যেন রক্তে দোলা লাগে। আর কিছু নয়?

সুখনরাম ম্লান হেসে বলে—বেটা নন্দ, হামিতো মরে গেছি। আমার গান আর হোবে না। তোমার গান শুনা। বহুৎ খুসবাই আছে তোমার গলামে। নসীবকা বাৎ বেটা। কই রোজ দেখবে তোমারা বড়িয়া নাম হয়ে গেছে। তা বেটা এক রোজ আও হামার ডেরামে, গান শুনাও।

—যাব একদিন সুখনজী।

সুখনরাম চলে গেলে, নসীবের কথাই ভাবতে থাকে বুঝি নন্দ। নসীবে ছিল বলেই না সোনার মাঠ ছেড়ে চলে আসতে হয়েছে? মাঠের সোনার ফসল ঘরে তুলে দাওয়ায় বসে বসে দোতারা বাজিয়ে গান গেয়ে গেয়ে কি সুখের জীবনই না ছিল? মাঠে মাঠে ঘুরে ঘুরে, গলায় সুর তুলে তুলে জীবনটা যেন কত বড়, কত খোলা মেলা ছিল? আজ ভিখারীর মত হাত পেতে ঘুরতে হচ্ছে। অন্যের দয়ার উপর নির্ভর করছে বেঁচে থাকাটা। যেন তার গানের মূলধনটা কিছুই নয়? সবাই দয়া করে পয়সা দিচ্ছে তাকে? কে জানে হয়তো সুখনরামের কথামতো নসীবে থাকলে অনেক কিছুই হতে পারে। কিন্তু এখানে থেকে কিছু হবে না। এখানে প্রথম দিন থেকেই তো দুর্ভাবনার দুর্ভোগ আরম্ভ হয়েছে তার? হয়তো আরও কত দুর্ভাগ্যকেই সে অজ্ঞাতসারে টেনে আনছে জীবনে।

অথচ—নন্দ ভাবে, অথচ—সুখে, শান্তিতে ভালভাবে বেঁচে থাকবার হক্ ওর কারো চাইতে কম ছিল না। রাজায় রাজায় যুদ্ধ হবে উলু খাগড়ার প্রাণ যাবে কেন? অথচ তাই গেছে। নন্দর মত কত হাজার হাজার মানুষ ভিখারী হল, আঁস্তাকুঁড়ে নেমে এল। মানুষের মত বাঁচতে কেউ-ই দিলে না ওদের। ভাগ্য বলে যারা চেঁচায় তারা জোচ্চোর? নন্দ কিছুতেই মানতে পারবে না একে ভাগ্য বলে। এসব লোভী মানুষের কারসাজি? নিজের নিজের স্বার্থসিদ্ধির লোভ। আর সেই লোভেই তো নন্দও আটকে গেল এখানে? নন্দর মাঝে মাঝে ইচ্ছে করে সেই লোভটার গায়ে গোটা কয়েক ছ্যাঁকা দিয়ে দেয়।

নন্দর মনে পড়ে দিনকয়েক আগে নদীর ধারে দেখা হয়ে গিয়েছিল কানাই মান্নার সঙ্গে। মান্না দেঁতো হেসে মুখ টিপে বলেছিল—কি গায়েন ডুবে ডুবে জল খাচ্ছ নাকি?

নন্দ হেসে নদীতে নামতে নামতে বলেছিল—দাঁড়িয়ে দেখ না খানিকটা।

—অটলা বলে কিরে? রস আছে তো শা'?

অটল বিরক্তির সঙ্গে মুখিয়ে উঠে বলে—দেখ্ কানাই, সব কিছুতে নাক্ গলাস না। তার পর দেখবি কেঁচো খুঁড়তে গিয়ে সাপ উঠে এসেছে।

—ধুস্, শালা ভয়েই ম'ল।

—উপেনদা, সনাতন খুড়ো ওর মুরুব্বি মনে রাখিস।

—যা, যা ছুচোর বাচ্চা গর্তে গিয়ে ঢোক।

—শালা মুখ খারাপ করবি তো, তোর একদিন কি আমার একদিন।

—ওরে তুলে; রোয়াবী দেখছিস অটলার। মান্না তার হাতের গুলি পাকিয়ে ফ্যা ফ্যা করে হাসতে থাকে।

—তোরা কি নিজেরা কামড়া কামড়ি করে মরবি নাকি?

কানাই বলে—দেখিস্ নি, বেটা আসার পর থেকেই সুন্দরী

কেমন ডগডগে হয়ে উঠছে। মাইরী, টপ করে ধরে খেয়ে ফেলতে ইচ্ছে করে রে তুলে। ছুঁড়ী, আমাকে মানুষ বলেই গেরাহ্য করে না। শালা মাঝে মাঝে ইচ্ছে করে ছুঁড়ীকে নদীর ধারে পুঁতে ফেলি।

টুকরো টুকরো দু'একটা কথা ছাড়া স্পষ্ট করে কিছুই শুনতে পায়নি নন্দ। কিন্তু কানাই মান্নার গলার স্বরটার তির্য্যক খোঁচাটা ভাল মনে হয়নি তার। কানাই বুঝি কিছু আঁচ্ করেছে। সে কি বুঝতে পেরেছে সুন্দরীকে আশা করবার মত সম্বলটুকুও এবার ছাড়বার সময় হয়ে এসেছে। কেমন করে বুঝল? নন্দ নিজে জানে, তার সাধ-আহ্লাদের কথা অন্তর্যামী ছাড়া আর কেউ জানে না। জানতে পারে এমন কাজও সে করেনি আকারে ইংগিতে। তবে কেমন করে আঁচ্ করল মান্না? সুন্দরীকে দেখে শুনে? তবে নন্দ জানতে পারেনি কেন?

দূর্ ছাই, যত সব বাজে কথা ভেবে ভেবে মরছে নন্দ। সুন্দরী বরং তাকে দেখলেই ঠোঁট ওলটায় অবজ্ঞার সঙ্গে, চোখা চোখা কথার বান্ ছুঁড়ে মারে। মেয়েটাকে কি ভয়ানক নিষ্ঠুর মনে হয়। মনে হয় কি অসম্ভব নির্লজ্জ? মাঝে মধ্যে নন্দর অবশ্য মনে হয় সুন্দরী যেন অকারণেই নন্দর উপর একটা আক্রোশ পুষে রেখে আর সুযোগ পেলেই ফোঁস ফোঁস করছে। এমন ধরনের আচরণের সঙ্গে নন্দর কোন কালে পরিচয় ছিল না। ওর স্বভাব লাজুকতায় ভারী অপ্রস্তুত বোধ করে সে সময় নন্দ। সুন্দরীর চোখে মুখে তখন ঝিলিক দিয়ে ওঠে খুসীর দুষ্ট হাসি। তার ব্যবহারে বিরক্তি বোধ করে নন্দ—ঠাস্ করে গালে একটা চড়্ কষিয়ে দিতে ইচ্ছে করে। কিন্তু আশ্চর্য হয়ে দেখে তার বুকের ভেতরের সাধটা কিছুমাত্র টোল খায় না। নন্দর মনে হয় কি একটা প্রাণান্তকর মোহ যেন তার মনের ইন্দি-ছিন্দিতে বাসা বাঁধতে আরম্ভ করেছে। শহরে ঘুরতে ঘুরতে কতবার পালাবার কথা মনে হয়েছে, স্টেশনের ট্রেন-

গুলো বার বার প্রলুব্ধ করেছে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত ফিরেই এসেছে নন্দ। উপেনের স্নেহ আর নিজের সাধ-আহ্লাদের কথা ভুলে যেতে পারেনি।

অথচ এই পরিবেশের অস্বাস্থ্যকরতা ওকে পীড়া দেয়। মানুষগুলোর ধরনধারন দেখে মনে ভয় আর অস্বস্তি বুট্ বুট্ করতে থাকে ; মান নেই, মর্যাদা নেই, নীতি নেই, যেন কেউ কারো নয়, কেউ কাউকে মান্য করে না, স্ব স্ব প্রধান। হাতাহাতি চুলোচুলি মুখখিস্তি যেন সব সময়ই লেগে আছে। দিনের বেলায় পুরুষরা এবং মেয়েদেরও অনেকে জীবিকার সন্ধানে বেরোয়। সন্ধ্যায় সকলে ফিরে এলে এই মাঠের প্রাণটা যেন চক্রান্ত, গুপ্ত কামনা, জৈব তাড়না প্রতিহিংসা আর পঁচাই-এর মাতলামিতে আরও বীভৎস অন্ধকার হয়ে ওঠে। ঘরে ঘরে কেরোসিনের আলো, বাইরে উনুনের আগুন প্রেতের মত মিট্-মিটিয়ে চায়, নাগিনীর মত লক্‌লকে জিব চাটে। ছায়া ছায়া মানুষগুলোর ঘোরা-ফেরা দেখলে শরীর ছম্ ছম্ করে ওঠে পৈশাচিক ভয়ে !

অথচ কি করবে নন্দ ? একটা সুখের কল্পনা নন্দকে একেবারে হাতে পায়ে বেঁধে ফেলেছে ? আহা সুখ ! সুখ কে না চায়। পৃথিবী সুদ্ধ মানুষ শুধু তো সুখী হতেই চায় ?

দিন দুই পর গান গেয়ে গেয়ে ক্লান্ত হয়ে একটু সকাল সকালই ডেরাতে ফিরে এসেছে নন্দ। দোতারাটা রেখে দরজার সামনে ইঁটের পাঁজাতে সবেমাত্র বসে গা'টা টান্ টান্ করে আড়-মোড়া ভাঙছিল আর হাই তুলছিল তুড়ি দিতে দিতে, এই সময় বউটি এসে একগাল হেসে দাঁড়ায়।

—কি গায়েন, আজ এত তাড়াতাড়ি ফিরলে যে ?

নন্দ একে আগে আর কখনো দেখেছে কি দেখেনি মনে করতে পারে না। বউটি কে এবং কোথায় থাকে তা না জানলেও দেখে শুনে এই মাঠের লোক বলেই মনে হয়। বউটি বিশ্রী একটা

ভঙ্গিতে নন্দর সামনে বসে বসে নানারকম প্রশ্ন আর কথা বলে যায়। নন্দর বুকের ভেতরে শির্ শির্ করে, রক্তে রক্তে একটা পশু গোঁ গোঁ করে ওঠে। নন্দ যখন ভাবছে কেউ দেখে ফেললে খারাপ ভাববে তাকে এবং বউটি এমন অসভ্যের মত বসেছে কেন তখন আশ্চর্য হয়ে দেখে বউটি যেন ইচ্ছা করেই অদ্ভুত কৌশলে বুকের উপর থেকে আঁচলটা সরিয়ে দেয়। পাতলা, গলার কাছে বেশ খানিকটা ছেঁড়া একটা জামা গায়ে তার। বুকের মাঝখানের দুটো বোতাম না থাকার জন্য সেখানটা বেশ বড় একটা বরফির আকার নিয়ে উদ্‌লা হয়ে আছে। শরীরের নড়াচড়ার জন্য থলথলে বুক দুটো ঢল ঢল করছিল। মাঝে মাঝে সেই অনাবরিত স্থানটুকুতে একটা লোভী ছুঁচোর মতই যেন স্তন দুটো মুখ বাড়িয়ে কিছু দেখছে একটু থেমে দাঁড়াচ্ছে, কখনো সরে সরে যাচ্ছে। আর! আর নন্দর অবাধ্য চোখের দৃষ্টি বড় বেশী সেদিকে ছুটে ছুটে যেতে চায়, যেন নিশব্দ হাতছানিতে তারা নন্দকে ডেকে নিতে চায়। নন্দর শ্বাস-প্রশ্বাস ফেলতেও কষ্ট হয় কেমন?

—তুমি বড় ভাল গান গাও গায়েন।

চুপি চুপি একটা ঢোকের সঙ্গে খানিকটা অস্বস্তি গিলে ফেলে নন্দ যেন রুগ্ন কণ্ঠে বলে—তুমি কোথায় থাক।

—তোমার কাছে কাছেই থাকি ; দেখতে পাও না বুঝি? বউটি মোহিনী হেসে নন্দকে একটি কটাক্ষ করে।

নন্দ যেন আরও দক্‌চে যায়। কোন একটা অজুহাত দেখিয়ে ঘরের ভেতরে চলে যাবে কিনা ভাবে সে এবং তা না করে একটু ঘুরে বসে অন্যদিকে চায়। দেখতে পায় রেলওয়ে কোয়ার্টার্স থেকে আসতে আসতে সুন্দরী হঠাৎ এদিকে চেয়ে একবার থমকে দাঁড়ায়। তার পর মুহূর্তেই কয়েকটা ডেরার আড়ালে অদৃশ্য হয়ে যায়।

নন্দ বিরক্ত ভাবে উঠে দাঁড়িয়ে বলে—আমি এবার রান্নাবান্না চড়াবো।

—তা চড়াও না ; আমি তো আর তোমার রান্নায় ভাগ বসাতে যাচ্ছি না। তোমাকে কচি কচি দেখে মনে কষ্ট হয়। আহা, বেচারা! তোমাকে যদি এটা সেটা খাওয়াতে পারতাম। তা কিছু করতে গেলেই তো শূয়ারগুলোর চোখ টাটাবে। তা গায়েন, মাঝে মাঝে তুপুরের দিকে এসো আমাদের ডেরায়। আহা! মা-বাপ মরা তুমি। ওই যে সবুজ চট্ দেখা যাচ্ছে, ওই আমাদের ডেরা।

কিন্তু এর পরই কেন যে বউটি তাড়াতাড়ি উঠে চলে যায় নন্দ বুঝতে পারে না। একটু পরে উপেন এসে জিজ্ঞেস করে—বিন্দী কি বলছিল গায়েন।

—বউটা কে উপেনদা? বড় অসভ্য তো?

—বুঝলে, আমাকে দেখেই বোধ হয় পালিয়েছে। ওর ত্রিসীমানায় ঘেঁষোনা গায়েন, নইলে ওর পাকে পড়ে যাবে। একদম ডাহা বেবুশ্যে। কোন বাদ-বিচার নেই। নরকের পোঁকা।

এরপর সব বিষয়ে সাবধান হতে চেষ্টা করেছে নন্দ। এখানে গা' ঘুলিয়ে ওঠার মত ব্যাপার-স্যাপার বড় বেশী, রক্ত চন্‌মন্ করে ওঠার ইংগিত প্রচুর, আর নগ্নতা তো মুড়ি-মুড়কীর মত ছড়িয়ে আছে। নন্দ কখনোই পারবে না ওদের সঙ্গে মিলে মিশে যেতে। তার রক্ত এক হলেও স্বভাবের ধাতটা বোধ করি অন্য ধরনের। একটা মনোমত ইচ্ছা পেয়েছে বলেই এখানে থাকতে চায় নন্দ। অন্ততঃ যে কয়দিন ইচ্ছাটার কোন হিল্লে না হয়। তার পর যে কোন দিন যে কোন জায়গায় চলে যেতে পারবে নন্দ। গলা যতদিন আছে পেটের জন্য ভাবতে হবে না তাকে।

উপেন একথা সেকথা বলতে বলতে রান্না চড়িয়ে দেয়। নন্দ কেমন আলস্য আর উন্মনা বোধ করতে থাকে। তার ধারণা আর অল্প-বিস্তর অভিজ্ঞতা স্মরণ করিয়ে দেয় মেয়ে-মানুষ ব্যাপারটাই কেমন অস্বস্তিকর। এরা যখন আসে তখন তুঃখ, তুর্বিপাক, তুর্ভাবনা সব যেন সঙ্গে করে নিয়ে আসে। পুরানো সব যেন ভয় পেয়ে

পালাতে থাকে? সুন্দরীর ভাবনাটা মনের ভেতরে ঘুর্ ঘুর্ না করলে আজকের এইসব দুর্ভাবনার কোন হদিস্ থাকতো নাকি? নিজের লোভাতুর মনটার উপর বিরক্ত হয় নন্দ।

উপেন উনুনের দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ বলে—বুঝলে গায়েন, এক একটা কম্ম এমন হয়ে যায় যে, কিছুতেই ভুলতে পারা যায় না। শোন, গায়ে-গতরে তখন বেশ ডাগর হয়ে উঠেছি, কি নষ্টামী করেছিলাম মনে নেই এখন। বাপ্ বেটা ভাত খেতে দেয়নি দু'বেলা। মায়ের অসুখ, ঘরে পড়ে পড়ে কোঁকাচ্ছে। সন্ধ্যাবেলা রান্না করছে বাবা। কি বলব গায়েন, মাথায় যেন খুন চড়ে গিয়েছিল, পেছন থেকে মাথায় বসিয়ে দিলাম এক লাঠির ঘা'। তার পর দে ছুট। রাতে রাতেই পাঁচ-পাঁচটা গ্রাম ডিঙ্গিয়ে গাড়ি ধরে শহরে।

নন্দ শিউরে উঠে বলে—খেতে দেয়নি বলে লাঠি মেরে বসলে তুমি উপেনদা?

উপেন ম্লান হেসে বলে—কি করব, মাথায় খুন্ চেপেছিল যে। কিন্তু ভুলতে পারি না গায়েন, রান্না বসালেই মনে পড়ে আর বুকটা জ্বলতে থাকে কেন জানি। বছর পাঁচেক পর একবার লুকিয়ে লুকিয়ে গেলাম গ্রামে। দুর্ ছাই, তিনবছর আগেই মা, বাবা মরে হেজে ভূত হয়ে গেছে। খুনেটার আর কোন পেছুটান রইল না। তার পর একবার মনে হল বিয়ে করব। মেয়েও ঠিকঠাক্ হল, দিনও ঠিক। বিয়ের সাতদিন আগে মেয়েটা মরল কলেরায়। বুঝলে গায়েন ধম্ম, অধম্ম, পাপ, পুণ্যি কিছুর আর তোয়াক্কা করিনি। একটা পাজী দুষ্ট ঘোড়ার মত কেবল লাথিয়ে লাথিয়ে চলেছিলাম। তা ভগবান সইবে কেন, পা'টা নিয়ে নিলেন। সব কিছুরই তো সীমা আছে গায়েন। আমি বলি বেশ হয়েছে। শালার পা না গেলে সোয়াস্তির মুখ দেখতে পেতাম?

—তুমি অনেক খারাপ কাজ করেছ, না উপেনদা?

—ভেবে চিন্তে তো করিনি। মনে হতো হঠাৎ তাই করতাম।

এখন বুঝতে পারি খারাপ না করলে ভালোটাকে বুঝতাম কি করে? যখন মনে পড়ে আমি অনেক লোকের ক্ষতি করেছি তখন মনে বড় অনুতাপ হয় গায়েন। তা আমার তো প্রায়শ্চিত্ত্য আরম্ভ হয়ে গেছে। গায়েন, তুমিও একটু প্রার্থনা করো, সব দুঃখ-কষ্টের ভেতর এই জন্মেই যেন আমি আমার পাপ শেষ করে যেতে পারি।

খোঁড়া উপেনের গলায় কি ছিল কে জানে, নন্দর বুকটা যেন ভিজে ওঠে। বলে—তাই করব উপেনদা।

নন্দর মনে হয় একটা পা হারিয়েই উপেন যেন ভগবানের রাজত্বে অনেকটা জায়গা পেয়ে গেছে। আজ তার লাভ-লোকসানে মন নেই, স্বার্থে মতি নেই। শুধু যেন ভালবাসার বুভুক্ষা নিরাকার ভগবানের নাগাল না পেয়ে জ্যান্ত একটা বিগ্রহ খুঁজে বেড়াচ্ছিল। আজ তা পেয়ে গেছে উপেন। পেয়ে শান্তি পেয়েছে, জীবন্ত হয়ে উঠেছে, নির্ভয় হয়েছে তার প্রাণ। নন্দ মনে মনে খুসী হয় আত্মীয়হীন এতবড় পৃথিবীতে সে আর একা নয় এখন?

রাতে যখন গান গাইছিল নন্দ তখন উপেনের চোখ দিয়ে দর্‌দর্‌ করে জলের ধারা নেমেছিল। যারা বসে বসে শুনছিল তারা যেন মনে মনে বলছিল—আহা! গায়েন আজ কি গাইছে মাইরী! মরি! মরি! সত্যিই নন্দর গানের যেন তুলনা ছিল না। আহা! ভালবাসাই তো সুখ! ভালবাসার আত্মীয় পেলে তো আরো সুখী হয়ে ওঠে জীবন! নন্দর মনে হয়, আহা! পৃথিবীর সব মানুষ যদি সকলের ভালবাসার আত্মীয় হয়ে উঠতো?

গানের আসর শেষ হতে না হতেই একজন বিশিষ্ট বেশধারী চশমা চোখে ভদ্রলোক এসে দাঁড়ায়। হাসিমুখে বলেন—তোদের আসর শেষ হল নাকি?

—এই যে আসুন, আসুন বাবু। বাবুকে একটা বসবার জায়গা দেরে।

—থাক্! থাক্! আমি বসব না। এবারকার শীতে তোদের

কম্বলের ব্যবস্থা করে দেব। কে কে তোদের টাকা মেরেছে সব নাম বলবি আমাকে। গয়ারামকে ধমকে দিয়েছি শশীর টাকা সে কালকেই দিয়ে দেবে। তা কানাই তুলে কোথায় গেল? ওদের দেখছি না কেন? দেখি একবার বেটাদের। বলে বাবুটি সেদিকে চলে যান।

নন্দ আরও ছ'একদিন দেখেছে সত্যপ্রিয় চৌধুরীকে। শহরের নাকি বিশিষ্ট একজন সমাজসেবী তিনি। নিরন্ন ছুর্ভাগ্যতাড়িত মানুষদের জন্য লড়াই করতেই তিনি ভালবাসেন। বিপদে-আপদে এদের পাশে এসে দাঁড়ান, নানারকম সাহায্য করেন। পরামর্শ দেন, শোকের দিনে সান্ত্বনা দেন। কেউ কেউ অবশ্য অন্যরকম কথা বলে। চৌধুরীবাবু লোকটা নাকি সুবিধের নয়। বিয়ে সাদী করেনি, অথচ ছুটি সোমত্ত বয়সের ঝি কাজকর্ম করার জন্য রেখেছেন বাড়িতে। কানাই তুলেকে তিনি খুবই খাতির করেন কেন এইসব নিয়েও লোকের চোখ টাটায়।

উপেন শুধু বলে—সকলেই ভাল। আমরাই খারাপ গায়েন। আমাদের তো চালচুলো নেই, আমরা তো ভয়ে ভয়ে থাকি, আমরা তো মানুষ নই? ভগবানের কি বিচার বুঝি না।

রেলওয়ে কোয়াটার্সে তখন একটি মানুষের নিঃশব্দ তীর্যক মনে আবর্তিত হয়ে চলেছে—না, ভগবান টগবান কিছু নয়। বিচারের ভার তার হাতে নয় তোমাদের হাতে। যার হাতে শক্তি তিনিই বিচারের রায় দেবার অধিকারী। তোমাদের লক্ষ লক্ষ হাত বিচ্ছিন্ন হয়ে আছে বলেই অশক্ত হয়ে আছে। হাত এক করো, তোমাদের সেই অসীম শক্তির কাছে মিথ্যা ভগবানের আকাশ ছোঁয়া নাম রূপ আরও নিষ্প্রভ হয়ে যাবে। তোমরাই ভগবান বিশ্বকর্মা। তোমাদেরই শোণিত আর ঘর্ম থেকে মানুষের তৈরী পৃথিবীর সমস্ত সমৃদ্ধি সমস্ত সৌন্দর্য। অথচ তোমরা সবচেয়ে বঞ্চিত। সবচেয়ে অবহেলিত সবচেয়ে অপমানিত। সত্যিকারের মানুষের সমাজ সৃষ্টি

হয়নি বলেই এই নিয়ম। মানুষের সমাজ মনুষত্বের নিয়মেই চলে। অনেক সহ্য করেছ আর নয়। এবার তোমাদের আর বলবার নয়, আদায়ের পালা। মুখোসধারী প্রবঞ্চকদের চিনতে শেখ, তাদের ভণ্ডামীর মুখে জোরে লাথি মারো। মনে রেখো শুধু, তোমার মত পৃথিবীর সকল মানুষই তোমার আত্মার প্রতিমূর্তি। তারা তুমিই।

সনাতন দিনকয়েক থেকে আর মহাজনের গদিতে যেতে পারছে না। শরীরটা ক্রমশই কমজোরি হয়ে আসছে, নানা রোগ এসে দেখা দিয়েছে। গতর খেটে খাওয়া মানুষের সঞ্চয় আর কতইবা থাকতে পারে? তবে সুন্দরীর খাওয়া-পরার ভার বইতে হচ্ছিল না বলে বুঝি কিছু জমেছিল। তাইবা আর কত?

ছেঁড়া ব্যাগ ময়লা জামাকাপড় পরা যে ডাক্তার বাবুটি মাঠের রোগীদের মাঝে মাঝে দেখতে আসেন, তাঁকে দু'বার এনে দেখিয়েছে সুন্দরী। মৃত্যুর ভাবনাটা সনাতনের কাছে বড় নয়, কতগুলো নেকড়ের মুখে সুন্দরীকে ফেলে যেতে হবে বলেই যেন কষ্টটা এত বেশী। এবার সেরে উঠতে পারলেই যেমন করে হউক একটা ব্যবস্থা করে ফেলবেই সনাতন। আহা! মেয়েটা যেন এই নরকে আকাশের তারা হয়ে এসেছে। এখানে তো দিন নেই রাত নেই তবু কি আলো মেয়েটার।

সুন্দরী মাষ্টারবাবুর বাড়িতে এখন আর বেশী সময় থাকতে পারে না—কাজগুলো সেরে দিয়েই চলে আসে। সনাতনের পথ্য হিসেবে এটা সেটা দিলে কৃতজ্ঞ চিত্তে নিয়ে আসে। ভাবে মানুষ ভাল হলেই এমন দরদ দেখায় নইলে কার দায় পড়েছে। বলে—বাবা, খা' দেখি। মাষ্টারবাবু, বৌদিদি দিয়েছেন।

—বড় ভাল মানুষরে সুন্দরী, বড় ভালমানুষ ওরা। গরীবের জন্য দয়া মায়া আছে।

যতক্ষণ সুন্দরী থাকে না সে সময়টা চারু এসে সনাতনের খোঁজ

খবর নেয়। চারুর ঘর কাছেই। পাশাপাশি গাঁয়ে একদিন বাড়ি ছিল তাদের। নিজের লোক বলেই মনে হয়।

দুপুরে সনাতনকে একদাগ ঔষধ খাইয়ে ঘরের বাইরে একটা চটের উপর বসে বসে ভিজে চুলগুলোকে আঙুলের সাঁড়াশী দিয়ে ছাড়াচ্ছিল সুন্দরী। ছোট্ট ভাঙা আয়নাটা আর কিছু দাঁত পড়ে যাওয়া চিরুণীটা পাশেই পড়েছিল। কিন্তু তার বসার ভঙ্গিতে কেমন যেন একটা অবসাদ নিরুচ্ছ্বাস মাতালের মত টলছিল। মাস কয়েক থেকে নিজেকে যেন আর খুব ধাতস্থ বলে মনে করতে পারছে না সে? দেহে-মনে এমন একটা বিতিকিচ্ছি আবহাওয়া এর আগে আর কখনো ছিল নাকি?

কিছু যে বোঝে না সুন্দরী তা নয়। বোঝে, নন্দ গায়েন এখানে এসেই তার মনে একটা ঝড় তুলেছে। মনের তলায় চাপা পড়া কতকগুলো সুখের ইচ্ছাকে চোখের সামনে বার করে এনে ধরেছে। সুখ কে না চায়? সুন্দরী তো জীবনভোর দুঃখী। সুখ তো সে বেশী করেই চাইবে? কিন্তু চাইলেই কি আর পাওয়া যায়? ভাগ্য হাতে ধরে না দিলে সুন্দরীর সাধ্য কি তাকে নাগাল পায়? অথচ যৌবনের দেহ মন কিছু বোঝে না। তাকে কুরে কুরে খায়, ফুঁসিয়ে তোলে, আশাহীন অবসাদে ভেঙে ফেলতে চায়। ঝট্ করে একটা কিছু করবে এমন সাহসের অভাব নেই তার, কিন্তু নোংরামীর ধাত্ নয় সুন্দরীর। নোংরামী দেখে দেখে, তার আচ গায়ে মেখে মেখে তাকে ঘৃণা করতেই শিখেছে সে। মাষ্টারবাবুর বাড়িতে কাজ করে করে তার সহবৎও পালটে গেছে। ভদ্রতা আর বিবেচনা যেন সুন্দরীকে অনেকটা হাত করে নিয়েছে। তাই তো কষ্ট আর অসুবিধায় পড়ে গেছে সুন্দরী।

তা ছাড়া সে বুঝতে পারছে, সনাতন আর বেশীদিন নয়। ডাক্তারবাবুরও তাই মত। এরপর তো সুন্দরী একেবারে অনাথা হয়ে যাবে? চারিপাশে কামুক নেকড়ের দল। তাদের থাবা

আর খামচানো থেকে কতদিন আর সে বাঁচতে পারবে। সুন্দরীর যে কেউ নেই অথচ সব সাধ-আহ্লাদ রয়েছে। নিজের ভাগ্যের কথা ভেবে আজকাল কান্না পায় সুন্দরীর। নিরিবিলিতে বসে বসে কাঁদেও সুন্দরী।

—হ্যাঁরে সুন্দরী, কাকা কেমন আছে রে?—চারু এসে পাশে বসে।

—ওষুধ খেয়ে ঘুমুচ্ছে চারুদি।

—পেটের ব্যাথাটা কখন কমল?

—ওষুধ খাবার পরই।

—তা, তুই এমন মন-মরা হয়ে বসে আছিস কেন? অসুখ বিসুখ কি আর কারো হয় না? ভাবিস না রে--কাকা ভাল হয়ে যাবে। ইস্ কতদিন মাথায় চিরুনী বসাসনি রে শুনি! আয় জট্‌গুলি ছাড়িয়ে দিই।

চারু চিরুনীটা নিয়ে জট্ ছাড়াতে বসে আর একথা-সেকথা নিজের মনেই বলে যায়। সুন্দরী ভাবে ভয় কি? এই তো চারুদি আছে, শশীদা আছে। রক্তের সম্পর্ক নেই বলেই কি আর আত্মীয়ের চাইতে কম?

চারু একসময় জিজ্ঞেস করে—হ্যাঁরে সুন্দরী, মাষ্টারবাবু জানালায় দাঁড়িয়ে অত কি দেখেন রে মাঠের দিকে চেয়ে চেয়ে।

বেশ কয়েকদিনের জড়ানো চুলে চিরুনী পড়তে কখনো ব্যাথায় চোখ-মুখ কুঁচকে যায় কখনো একটা আরামের পুলকে দু'চোখ বুজেও আসে। সুন্দরী চোখ বুজেই উত্তর দেয়—মাষ্টারবাবু নাকি বই-টই লেখেন। বৌদিদি তো বললেন আমাদের এই মাঠটা নিয়েও নাকি তিনি কিসব লিখবেন।

—ওমা কি কথা রে? কি হবে তা হলে

—কি আবার হবে?

—ছিঃ ছিঃ কি ঘেন্নার কথা হবে না?

বৌদিদি বলেছেন—যারা লেখে তারা নাকি নাম বদলে দেয়। তাই চেনাই যায় না কোথাকার কি। উহু-হু···চারুদি আস্তে টানো।

—তা রাজ্যির জট্ ফেলেছিস।

সুন্দরীর কেমন যেন মনে হয় মনের ভেতরও কি কম জট্ পড়েছে? এই যে আজ দেহের সুখ-দুঃখ, বাপের অসুখ, নন্দ গায়েনের ছোবল মারা, নেকড়ে দলের উঁকি ঝুঁকি তাকে এক মুহূর্ত তিষ্ঠুতে দিচ্ছে না, তা ছিল কোথায় এতদিন? এখন প্রতিদিনই সেগুলো জটাকার হয়ে উঠছে, তৈলাক্ত মাছের ভেতরের জব্‌জবে তেলের মত পচ্ পচ্ করছে আর যেন দিনের পর দিন সুন্দরীকে চটিম চাটিম বুলির মত কাবু করে ফেলছে। সুন্দরীর রগরগে মনটা ছুক্ ছুক্ করে ওঠে—অথচ চোখ আর মনের নোংরা অন্ধকারটা কেটে গেলে ভাবে কি করবে সে। কি করবে।

বৌদি বলেছিল সেদিন—তুই যেতে চাস্ তো, তোকে আমার মায়ের কাছে পাঠিয়ে দেবো। খুব ভাল থাকবি সেখানে। কোন বিপদ আপদ হবে না তোর।—কেন জানি খুব খারাপ লেগেছিল সুন্দরীর। কেন? এখানে তার কাছে রাখতে দোষ কি হল? নারীর সহজাত চাতুর্যেই বুঝতে পেরেছিল সুন্দরী তার ভয়ানক শরীরটার কাছে মাষ্টারবাবুকেও রাখতে সাহস পায় না বৌদিদি। সে নাকি লাউডগা সাপের মত। দেখলে মুগ্ধ অস্বস্তিতে রক্তের ভেতর নাকি একটা ইচ্ছা গন্‌গনিয়ে ওঠে; মাতলামির ঢল নামে। অথচ দেখো, সেই গোবর গণেশটার রক্তের কোন সার নেই। মনের ভেতরে পুটুর পুটুর করে কিনা কে আর জানতে পারছে সেকথা।

চারু তখন বিনুনী বাঁধছিল, বলে—বিন্দীটা এখন গায়েনের সঙ্গে ঢেমনিপনা করতে চাইছে। কচি দেখেছে তো। উপেনদা এদিক ওদিক গেলেই ঘুর্ ঘুর্ করে দাঁত বসাতে চায়। ও মাগী গতরটাকে এত হেনস্তা করে, ব্যারামও তো হয় না; ফাটও ধরে না।

—ধরবে কেন ? কানাইদের অনেক টাকাই তো ও চুষে নেয়। ভালমন্দ খুব খায় যে ছেনালী।

—গায়েনকে সাবধান করে না দিলে বেচারা যে ওর খপ্পরে পড়ে যাবে রে সুন্দরী ? শুনি তো কাকাকে মাঝে মাঝে দেখতে আসে, গান টান্ শোনায়।

—আর বিড়ালের মত পিট্ পিট্ করে আমাকে দেখে।

—পিট্ পিট্ করে কেন দেখে ?

—সাহস কোথায় ? গোবর গণেশ যে !. সাত চড়েও মুখে রা' ফোটে না।

চারু মজা পেয়ে হেসে ফেলে, বলে—দূর্, তুই নয়-ছয় বলছিস্ তা তোর যেন গায়েনের উপর রাগ রাগ ভাব !

—আমার আবার রাগ কোথায় ? একটা বোদকা মাটির ঢেলার উপর রাগ করব কেন চারুদি। ওর কোন সার আছে নাকি ?

—হঃ হঃ।—চারু হাসতে থাকে আর বলে—তবে তো তোর পিরীত পিরীত মন করছে। তা তুই ভাল করে চোখ দিচ্ছিস না কেন ? তোর চোখ পড়লে বিন্দীর নষ্টামো থাকবে নাকি ?

সুন্দরী মনে মনে একটা রোমাঞ্চিত আবেশ আর গর্ব অনুভব করে। ভাবে, সুন্দরীও তার ছোবলের সঙ্গে বিষ ঢেলে দিয়েছে খানিকটা। টনক নড়েছে নন্দর। তারও যে রক্ত খারাপ হয়ে উঠেছে তা কি আর টের পায়নি সুন্দরী ? নন্দ যদি কানাই অটলের মতই একদিন নেকড়ে হয়ে ওঠে, ওৎ পেতে থাকে অন্ধকার আনাচে কানাচে, আশশেওড়া বনতুলসীর জঙ্গলের আশে পাশে, নদীর পারে, ঝোপের ধারে। তা বোধ হয় পারবে না নন্দ গায়েন ? নন্দ বড় ভীতু, নন্দ বড় লাজুক। নন্দ যে গান গাইতে গাইতে বেহুস হয়ে যায় ? কিন্তু সুন্দরী মনে মনে বলে—একদিনও যদি একটা নিশাচর জন্তু হয়ে ওঠে গায়েন, তবে ক্ষতি কি ? নন্দর সম্বন্ধে সুন্দরীর কোন ক্ষতিই ক্ষতি মনে হয় না কেন ? সুন্দরীর মন কেমন

করে? তার পুরুষ্টু দুটি বুক বিষক্রিয়ায় টন টন করতে থাকে। রাত্রির অন্ধকারে বিছানায় শুয়ে শুয়ে বিচিত্র অঙ্গ-ভঙ্গির মাঝে তার প্রত্যাশাকে চেখে চেখে দেখে সুন্দরী। খুশী হয় কষ্ট পায়, স্বপ্নটা দীর্ঘসূত্রী হয়। আলো জ্বলে জ্বলে এক সময় নিভে যায়। আবার জ্বলে আবার নেভে।

সন্ধ্যার দিকে উপেন আর নন্দ সনাতনকে দেখতে আসে। প্রায়ই আসে ওরা। কেন আসে কে জানে। হয়ত এখনো ওদের ভেতরে মানুষগুলো বেঁচে আছে—বেঁচে আছে সুন্দর সুস্থ্য মানুষের অনেক সদ্‌গুণ। কানাই আসছিল তার লোভের গরজে দরদ দেখাতে, উপেন আর নন্দকে ডেরায় ঢুকতে দেখে শূন্যের প্রতি একটা অশ্রাব্য মুখখিস্তি করে নিজের ডেড়ায় ফিরে যায়।

—কেমন আছ খুড়ো?

সনাতন আজ একটু বুঝি ভাল আছে, পেটের ব্যথাটা কম। বলে —আর থাকা উপীন। বুড়ো হয়েছি, শেষ ডাক আসবে কিন্তু বড় কষ্ট হচ্ছে সুন্দরীর কথা ভেবে। ওর মা মাগী মরে গিয়ে মেয়েটাকে করলে কোলছাড়া। আর আমিই বা কি করলাম।

—অত ভেবো না খুড়ো, এই তো ভাল হয়ে উঠলে বলে।

—উপীন আমার হয়ে এসেছে।

—কি যে বলো, বুড়ো হয়ে তোমার ভীমরতি ধরেছে খুড়ো।

সনাতনের দুটো চোখে জল জমা হয়েছিল, কোণ বেয়ে এবার তা গড়িয়ে পড়ে। বলে—উপীন মেয়েটাকে দেখো। মেয়েটা যে আর সকলের মত নয়। তাইতো কিছু গতি করতে পারলাম না।

সুন্দরী ঘরের এক কোণে বসে তৈজস-পত্রের এটা-সেটা নেড়ে চেড়ে কিছু বুঝি খুঁজছিল। বসেছিল নন্দর দৃষ্টির পাশঘেঁষা পেছনে। নন্দ যতবারই চোখ ফিরিয়ে সুন্দরীকে দেখতে চেয়েছে ততবারই চোখাচোখি হয়ে গেছে। নন্দ চোরের লজ্জায় সংকুচিত

আর ভীত হয়েছে, সুন্দরীর মন চোখের অতলে ঝিল্ ঝিল্ করে হেসে উঠেছে।

—উপেনদা, তুমি একটু বসো গো। বাবার বার্লি ফুরিয়ে গেছে। আমি ছুটে নিয়ে আসি।

উপেন বলে—তা তুই কেন, আমাকে দে নিয়ে আসি। বার্লি যখন করবি তখন একটু জলও উনুনে বসিয়ে দে। আমি চা গুড় নিয়ে আসব।

—চা আর গুড় আছে। তুমি একটু দুধ নিয়ে এস উপেনদা।

উপেন চলে গেলে সুন্দরী এলুমিনিয়ামের বাটিতে জল বসায় উনুনে। নন্দর চোখের সামনেই পেছন ফিরে বসে চায়ের জোগাড় করছিল সুন্দরী। কেমন যেন নূতন লাগছে আজ তাকে। অনেক সুন্দর আর বুক ধক্ করে ওঠা আকর্ষণীয়। অনেক চুল সুন্দরীর, এতদিন পায়রার বাসা হয়ে ছিল, আজ বিনুনী হয়ে পিঠের এপাশে ওপাশে লতিয়ে লতিয়ে হঠাৎ এক একবার সাপের মত ছোবল মারছিল। সেই ছোবল যেন নন্দর বুকের ভেতরই পড়ছিল, বিষাক্ত হয়ে উঠছিল তার প্রগাঢ় যৌবনের লোভ।

সনাতন বলে—গায়েন, হরিনাম তো অনেক শোনালে, শেষদিনে একটু শুনিয়ে দিও যেন বাবা। পাপ করলেই তো গরীব হয় মানুষ। আর জান গায়েন, গরীব হলে আরও কত গুচ্ছের পাপ করতে হয়। আঃ শালার জীবনটা কেবল খাবি খেয়ে খেয়েই গেল বাবা।—বলতে বলতে কেমন ঝিমিয়ে আসে সনাতন, চোখ দুটি বুজে নিঃসাড় হয়ে পড়ে থাকে।

ওদিকে রামচরনদের আস্তানার দিক থেকে একটা কোন্দল আর শিলাবৃষ্টির মত মুখখিস্তির কোলাহল ভেসে আসে এই সময়। দূর থেকে শুনে মন হয় যেন খুনোখুনি লেগে গেছে। আসলে—সামান্য বিষয় নিয়েও এদের মাথা আর হাত-পা সমস্ত সংযমের সীমা ছাড়িয়ে যায়; ক্রোধ আর অসূয়াটা মাত্রাতিরিক্ত

হয়ে ওঠে। ব্যাপারটাকে দুজনে থেকে দশ জনের ভেতর নিয়ে আসে। কিল, চড়, লাথি চলে, কারো একমুঠে চুল উঠে আসে, কারো কান দাঁত দিয়ে কেটে নিয়ে যায়। সেবার ঝগরু তো মিশিরের বউ-এর বুকের খানিকটা দাঁতে কেটে নিয়ে সেই যে পালিয়ে ছিল আর পাত্তা পাওয়া যায়নি তার।

তাছাড়া প্রায়ই দেখা যায় অতি তুচ্ছ কারণেও এর ওর বউ মুখের গালিগালাজ ছেড়ে এক সময় হাতাহাতিতে নেমে এসেছে। তখন প্রায়ই তাদের গায়ে পরনে কাপড়ের আর আড়াল থাকে না। বিশটা লোকের সামনে সেই অর্ধ উলঙ্গ মূর্তিতেই তারা চুলোচুলি করে। এসব এদের গা' সহা ব্যাপার। বরং ওরা আমোদ বোধ করে। সপ্তাহে এমন একটা ঘটনা না ঘটলে ভারী নিরাশ হয়।

নন্দ বোধ করি ঘটনাটা কি তাই জেনে আসবার জন্য উঠে দাড়িয়েছিল। সুন্দরী বাধা দেয়।

--না গায়েন, তোমার গিয়ে কাজ নেই।

নন্দ অবাক হয়ে ফিরে চায়। এই প্রথম সুন্দরী তার সঙ্গে কেমন যে এক আলাদা সুরে কথা বললে। এর আগে তার কথায় চিমটি আর খামচি জাতীয় ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ ছিল বড় বেশী। নন্দকে যেন মানুষ বলেই গ্রাহ্য করত না!

—কুত্তার পাল কামড়া কামড়ি করছে, তোমার গিয়ে কি হবে? না গান গেয়ে ঝগড়া থামাবে গায়েন।

আবার সেই চিমটি। নন্দ মুখ গোঁজ করে বসে থাকে।

সুন্দরী ফিস ফিস করে বলে—রাগ করলে নাকি গায়েন?

সুন্দরীর গলার স্বরে আকৃষ্ট হয়ে ফিরে চায় নন্দ। কেরোসিনের আলো জ্বলছিল ঘরে। অন্ধকার অন্ধকার ছমছমানো ঘরে, স্বল্পালোকিত মুখে এক চিলতে মোহিনী হাসি নিয়ে চেয়ে আছে সুন্দরী। নন্দর বুকের ভিতরে যেন একটা কাল কেউটে

হিল্ ফিল করে চলতে ফিরতে আরম্ভ করে। কিন্তু— নন্দ বলে —রাগের কথা বল্লে, রাগ হয়।

—তোমার তাহলে রাগ আছে শরীরে।

—সব মানুষেরই থাকে।

—তুমি তো ছেলেমানুষ গায়েন—সুন্দরী কোথায় খোঁচা দিতে চায় কে জানে। কিন্তু এত শান্ত, সংযত নন্দর চোখের ভেতরও যেন এবার এক ঝলক, আগুন লাফ দিয়ে ওঠে।

—বেশ আমি ছেলেমানুষ কিনা দেখবে একদিন।

—ওরে ব্যাস্, মাঠের হাওয়া লাগিয়েছো' বুঝি গায়ে।

—মাঠের কেন লাগবে? তুমি কম লাগিয়েছ নাকি? তুমি তো ইচ্ছা করে করে······

—ওমা কোথায় যাবগো। গায়েন, সাত চড়ে কথা বলতে না; এখন যে খই ফুটছে। শিখলে কোথায়? বিন্দীর কাছে নাকি?

সনাতন হয়ত ঘুমিয়ে পড়েছে। নন্দ ঝট্ করে উঠে দাঁড়িয়ে ভ্রূ-কুঞ্চিত বিরক্তির সঙ্গে সুন্দরীকে একবার দৃষ্টি বিদ্ধ করে ঘরের বাইরে এসে দাঁড়ায়। সুন্দরীও মুখ টিপে হেসে তখনি ব্যস্ত ভাবে এসে অন্ধকারে নন্দর একটা হাত চেপে ধরে।

—রাগ করছ কেন গায়েন। তোমাকে সাবধান করে দিলাম যে?

—আমাকে করতে হবে না। তুমিই সাবধান থেকো।

—তাহলে।—অন্ধকারে সুন্দরী বুঝি একটু হাসে।

নন্দর হাত ধরে একেবারে তার গায়ের সঙ্গে বুঝি লেপটেই দাঁড়িয়েছিল। নন্দ বুঝতে পারে, তার বাহুতে মাখনের মত একটা নরম সুখদায়ক স্পর্শ চেপে বসে আছে। চারিদিকে অন্ধকার আর অন্ধকার? ঘন যৌবনের দুটি অভুক্ত অস্নাত প্রেতাত্মার মাথায় স্নায়ুতে আগুন জ্বলে উঠবার আগেই ঘর থেকে সনাতনের কণ্ঠ ভেসে আসে।

—কোথায় গেলিরে সুন্দরী— ?

সেই তুলতুলে মাখনের মত নরম আবেশটা এবার সরে যায়। নন্দর হাতে একটু টান মেরে সুন্দরী ডাকে—এস গায়েন !

সুন্দরীকে দেখে সনাতন বলে—উপেন কি এলরে ?

—না বাবা। ক্ষিধে পেয়েছে তোমার ?

—না। ক্ষিধে পায় না কেন বল্ দেখি। ষাট বছরে অনেক খেয়েছি, তাই না ? গায়েন, দিন ফুরিয়ে এল। চোখে কেবল অন্ধকার দেখি এখন। উঃ।

—বাবা কথা বলো না, চুপচাপ শুয়ে থাকোত।

সনাতন চুপ করে চোখ বুজে সেই শেষের দিনটির কথাই ভাবে কিনা কে জানে।

নন্দ বসেছে সুন্দরীর খাটিয়াটার উপর। কাছেই ওর পায়ের কাছে মাটিতে এবার আর আড়াল করে নয়, মুখোমুখীই বসেছে সুন্দরী। লাল কেরোসিনের ধোঁয়ায় হারিকেনের কাঁচটা কালো হয়ে আলো অন্ধকারে কেমন যেন ভুঁতুরে ভুঁতুরে হয়ে উঠেছে ঘরটা। উনুনে চায়ের জল বুট বুট করে ফুটছে। সেই শব্দে যেন দুটি বাসনা—ব্যাকুল মনেরই অব্যক্ত সহমর্মীতা।

—গায়েন, দিন ভর এত গান গাও, কষ্ট হয় না তোমার ?

—হয়। হলে আর কি করব।

—রোজগার পাতি কেমন হয় ?

—আগে তো ভালই ছিল। এখন বুঝি মানুষের অবস্থাই খারাপ হয়ে গেছে। নিজের পেটের আগে তো আর গান নয় ?

—তা একটা কাজ-টাজ জুটিয়ে নিতে পার না। একটা বাঁধা-ধরা আয় থাকতো।

—কাজ কোথায় পাব ? গান ছাড়া আর কিছু তো জানিনা।

—একলা মানুষ, পয়সা কড়ি জমাওনি কিছু।

—জমে আর কোথায়।

সুন্দরী যেন রাগ করে এবার, বলে—আচ্ছা বোকাতো তুমি? ভবিষ্যতের কথা ভাব না নাকি?

নন্দ তেরছা চোখে সুন্দরীকে লক্ষ্য করে। হাটু দুটি বুকের কাছে গুটিয়ে নিয়ে দু' হাতে জড়িয়ে বসেছে। হাটুর চাপ্ লেগে ফর্সা স্বাস্থ্যোজ্জ্বল বুকের খানিকটা গলার ঝাছে জামার সীমা পেরিয়ে ঊর্ধগতি হয়ে উঠেছে। হারিকেনের লাল আভা সেখানে হলুদে পরাগ রেণুর মত রসনা আর বাসনাকে হাতুরি পেটা করে চলেছে। অকস্মাৎ কেন জানি নন্দর মনের ভেতরে একটা রাগ চিড়-বিড় করে ওঠে।

—আমি বোকা! তুমিতো খুব চালাক? তুমি কয় পয়সা জমিয়েছ শুনি দেখি? মাষ্টার বাবুর বাড়ীতে কাজতো অনেক দিন করছ।

সুন্দরী ঠোঁট উলটে বলে—ওরে, আমার গুরু ঠাকুরের, কৈফিয়ৎ চাইতে এলেন। তোমার ভবিষ্যত তুমি ভাববে, আমার কি? ভাল কথা গায়ে লাগবে কেন? ফষ্টি-নষ্টির দিকে মন গেছে কিনা। —বলেই সুরুৎ করে উনুনের দিকে ঘুরে বসে সুন্দরী।

নন্দর সমস্ত দেহে একটা অসম্ভব জ্বালা রি রি করে ওঠে। তার ভেতর কার গোঁয়ার মানুষটার ইচ্ছা করে সুন্দরীর ওই ছিম-ছাম লোভনীয় শরীরটাকে আছড়ে দিয়ে তার সব অহংকার আর চেটাং চেটাং বুলির দফারফা করে দেয়?

বাইরের অন্ধকারে এই সময় উপেনের লাঠির ঠুক ঠুক আওয়াজ শোনা যায়। উপেন যেন নিজের মনেই বলছিল—শালাদের খেয়ে দেয়ে গুতোগুতি ছাড়া আর কাজ নেই রে। বুঝলি সুন্দরী, ঘুটে নিয়ে রক্তারক্তি কাণ্ড। বিন্দেশ্বর মাথা ফাটিয়ে দিয়েছে লাইন মেন জগদীশ প্রসাদের। বাছাধনকে এবার ঘানি টানতে হবে বছর দুই।

সুন্দরী ফিরে বসে দেখে নন্দ ঘরে নেই। কখন যে নিঃশব্দে উঠে চলে গেছে তার কিছুই টের পায়নি সে!

আজকাল নন্দ রোজই বসে বসে ভাবে সত্যিই তো ভবিষ্যত না থাকলে আর মানুষ কি? ভিটে ছাড়া হবার পর শুধু তো উড়ে উড়ে বেড়িয়েছে আর এখান সেখান থেকে খুটে খুটে খেয়েছে। ভেবেছে একলা মানুষ চলে যাবে। কিন্তু চিরকাল কি মানুষ একলা থাকে? না, একলা থাকতে ইচ্ছে করে? যতদিন ছিল ততদিন ছিল। এখন একলার কষ্ট ও যা দোক্‌লার কষ্ট ও তাই। উপেন তাকে এখানে নিয়ে না এলে আর সুন্দরী না বললে ভবিষ্যতের ভাবনাটা মনে আসত নাকি নন্দর? এখন ভাবে। ভাবে ভবিষ্যতের কথা; কাজের কথা, ভাবে পয়সা-কড়ি জমানোর কথা। সঙ্গে সঙ্গে তার যৌবন বয়সের মত আরো রাজ্যের ভাবনা ভেবে ভেবে মরে।

নন্দ এখন স্পষ্টই বুঝতে পেরেছে এই মাঠের বাসিন্দারা কতগুলো জন্তুর মতই জীবন যাপন করে চলেছে। জন্তুর মতই তাদের দিন নেই, রাত নেই, দেহবোধ আহার্য্যের উদগ্র তাড়না নিয়ে ঘুরপাক খাচ্ছে। এখানে সুখ নেই, শান্তি নেই। এখানকার মানুষগুলো যেন আর মানুষ নেই। কিন্তু মানুষের মত হতে না পারলে সুখ কোথায়? নন্দ বোঝে মানুষের মত হতে গেলে অনেক দাবী আর অধিকার হাতে পেতে হবে, স্বাভাবিক মানুষ হতে পারার সুযোগ সুবিধা পেতে হবে। কিন্তু বাবু সমাজের চোখেতো তাদের প্রতি উপেক্ষা ঘৃণা আর উপহাস? নন্দ ভাবে তাহলে কি তাদের কোন ভবিষ্যত থাকবে না? জন্তুর ভবিষ্যতই তাদের ভবিষ্যত? নন্দর বড় রাগ হয়, কার উপর রাগ হয় জানে না।

একদিন উনুনে ভাতের হাঁড়ি চাপিয়ে নন্দ বলে—উপেনদা রোজগার পাতিতো দিনের পর দিন কমেই যাচ্ছে।

—তাতো যাবেই। মানুষের অবস্থা কি আর আগের মত আছে?

—আমি বলছিলাম, একটা কাজ-টাজ নিলে হয় না।

—কাজ বুঝি রাস্তায় রাস্তায় ছড়িয়ে আছে গায়েন। তা অত ভাবছ কেন, আমি তো আছি? দু' ভায়ের চলে যাবেই কোন রকম করে।

—তা আর কার না চলে। কিন্তু ভবিষ্যতের কথা ভাবতে হবে না উপেনদা?

—আমি কি আর ভাবিনি গায়েন। ভাবছি! ভাবছি। তুমি গান টান্ ছেড়ে দিয়ে একটা মুটে মুজুর হবে তা আমার ভাল লাগে না। আহা! ভগবান তোমাকে কি গুণ দিয়েছে তুমি জানবে কি করে!

গুণের খবর নন্দ আর কত জানবে? কিন্তু বোঝে নাকি তার গলায় এখন একটা কিছু আছে; যা মানুষকে সহজেই বশ করে ফেলে। লোকে মাথা দোলায়, বাহবা দেয়, আহা, উহু করে। মাঝে মাঝে তো নিজেরই সুরের মাদকতার আবেশে তার নিজের চোখই বুজে আসে? বুক ভরে যায়, সব দুঃখ-কষ্ট, দুর্ভাবনা কোথায় যে থাকে তখন কে জানে। নিজেকে কেন জানি তখন ওই টাকা পয়সার উপর বসে থাকা মানুষ গুলোর চাইতেও অনেক সুখী মনে হয়। নন্দ ভাবে, উপেনদা তো সারাজীবন কিছুই পায়নি, শেষ বয়সে গান পেল, সঙ্গে পেল ভালবাসা, ভাই, ভাইয়ের দায়িত্ব। তাতেই কি সুখী হয়ে উঠেছে উপেনদা? আহা উপেনদা কেন কিছুই পেলনা?

নন্দ দোতারাটা তুলে চোখ বুজে গান ধরে—

আমি তারেই খুঁজে বেড়াই
আমার মনের মানুষ যেরে
হারায়ে সে মানুষে দেশ-বিদেশে
বেড়াই ঘুরে—
আমার মনের মানুষ যেরে।

আজকাল নন্দ মাঝে মাঝে লক্ষ্য করলেই বুঝতে পারে মান্না

এখন আর রোয়াব দেখায় না, হেসে হেসে মোলায়েম করে কথা বলে তার সঙ্গে। বলে—বড় ভাল গাও গায়েন। একদিন আস ভেরায়। খানা পিনা করি, গান শুনি। গতর খেটে খেটে জীবনটা কালি হয়ে গেল না?

নন্দ বলে—যাব একদিন সময় করে।

আরও বুঝতে পারে নন্দ বিন্দী যেন নানা ছল-ছুতায় আশে পাশে ঘুর ঘুর করে, মিষ্টি করে হাসে, লোভ দেখায়। নন্দ জানে বিন্দীর লোভ নূতন রক্তের আস্বাদের জন্য। ওর রক্তটা খারাপ, কি করবে বিন্দী?

ইদানীং সনাতনের অবস্থা ক্রমে-ক্রমেই খারাপ হয়ে আসছে বোঝে সকলেই। কিন্তু যতক্ষণ শ্বাস ততক্ষণ আশ। মাঝে মাঝেই গিয়ে হরির নাম শুনিয়ে আসে নন্দ। এই তো কালও গিয়েছিল সে। সুন্দরীর সঙ্গে কোন কথা হয়নি। কি আর বলবে। সাপিনী আবার কখন ছোঁবল মেরে বসবে কে জানে। কিন্তু আড়ালে আড়ালে দেখেছে, দুশ্চিন্তা, রাত্রি জাগরণ আর নাওয়া-খাওয়া নিয়ম মত না করে করে কেমন শুকিয়ে শুকিয়ে কাঠ হয়ে উঠেছে। কষ্ট হয়েছে কিন্তু খুসী ও হয়েছে নন্দ। এবার যদি কাল-নাগিনীর বিষ দাঁত ভাঁঙ্গে। কি মোলায়েম মিষ্টি করে কথা বলতে বলতে হঠাৎ হর-হরিয়ে ওঠে পেটের বিষ। জ্বালা ধরে যায় সমস্ত গায়ে।

কিন্তু নন্দর মনে হয় কি একটা রাগে কেবলই ভেতরে ভেতরে গর গর করছে সুন্দরী। চোখের তারায় সেই আগুনের তাপ, গন্ গন্ করে ওঠে কখনো কখনো! কখনো দেখতে পায় তাকে দুঃখ দুর্ভাবনায় অস্থির; কখনো একটা প্রচণ্ড নিরাশায় দুমড়ানো পুতুলের মত, কখনো কি বিশ্রী খিট্‌খিটে। সেদিন তো একটু দূরে দাঁড়িয়ে থেকে অটুলার উদ্দেশ্যে মুখ খিস্তি করে উঠতেই শুনেছে নন্দ। নন্দর ভারী খারাপ লেগেছিল। সুন্দরী তো ভদ্রলোক ভদ্রলোক

হয়ে উঠেছে, তার মুখের খিস্তিগুলো শুনতে তাই বোধ করি খারাপ লেগেছিল নন্দর।

বিকালে রোজগার থেকে ফিরে এসে ভাটাপড়া রোজগারের কথাই বুঝি ভাবছিল নন্দ। উপেন এখনো ফেরেনি। সুন্দরীকে শন্‌-শনিয়ে দোকানের দিকে যেতে দেখে সাত পাঁচ ভেবে ডেকেই ফেলে নন্দ—ওঃ সুন্দরী। একটা কথা শুনবে।

সুন্দরী থমকে থেমে থমথমানো মুখে ফিরে দাঁড়ায় একবার। তারপরেই আবার গন্তব্য পথে চলতে আরম্ভ করে। কিন্তু কয়েক পা' গিয়েই ফিরে এসে নন্দর কাছে দাঁড়ায়। বলে—সুখে আছো কিনা তাই গলায় সোহাগ শুর শুর করছে তোমার গায়েন।

নন্দ মনে মনে বলে ভালোরে ভালো।

—খুড়ো আজ কেমন আছে সুন্দরী।

—আহারে! কি দরদ, তোমার পেটের ভাত হজম হচ্ছে না বুঝি।

নন্দ রাগ করে বলে ফেলে— তোমার মুখের আগল নেই কেন সুন্দরী। তুমি বড় খারাপ মেয়ে তো?

—কি! আমি খারাপ মেয়ে? কে। কে বলে শোনাও দেখি?—সুন্দরী অপরিসীম রাগে চির্‌ চির্‌ করে ওঠে। বলে—গায়েন তুমি বলে পার পেয়ে গেলে। অন্য কেউ হলে তার মুখ খুলে নিতাম দেখতে? যে মায়ের বেটা-বেটিরা বলবে আমি খারাপ কাজ করেছি তারা নিজেরাই বেজন্মা। তারা বজ্জাৎ।

নন্দ প্রমাদ গোনে। ভয় পেয়ে আর লোক জরো হবার আশংকায় শিটকে উঠতে থাকে। তাড়াতাড়ি চুপশানো গলায় বলে—সুন্দরী, ও সুন্দরী, আমি কি তাই বললাম নাকি? তুমি আজকাল বড় খিট্‌খিটে হয়ে উঠেছ তো।

—গায়েন তোমার বড় পায়াভারী হয়েছে এখন। নাহয় ভালই গাও। তাই বলে ধরাকে সরা জ্ঞান করবে নাকি? মানুষজনকে যাচ্ছেতাই করবে নাকি?

—বাঃ আমি কি করলাম ? আমি তাই করেছি নাকি ?

—আর কেমন করে করবে শুনি ? তুমি আর ত্বলে বাগ্দীর ভেতর তফাৎটা থাকল কোথায় ? দেখ্ছি সব শেয়ালের এক রা'। —বলেই হন্ হন্ করে দোকানের দিকে চলে যায় সুন্দরী।

নন্দ বিমূঢ়ের মত সেদিকে চেয়ে বসে থাকে। এযে কোথা থেকে কি হয়ে যায় কিছুই বুঝতে পারে না সে। সুন্দরীকে কোন রকমেই এটে উঠতে পারে না নন্দ। এক সময় মনে হয় অপরাধটা তার নিজেরই. রাগ হয় নিজের উপর। বোকা। ডাহা বোকা বলে নিজেকে খোঁচায় নন্দ।

—কেমোন আছে গায়েন, রোজগারপাতি কেমোন ?—সুখন রাম একপাশে বশে বা' তালুর খৈনীতে ত্বটো থাপ্পর বসিয়ে দিয়ে একটা ফুঁ লাগায়।

নন্দ বলে—বহুৎ খুব ভাটা হ্যায় সুখনজী।

—সব কিছু মে এ্যাসাই তো হোচ্ছে আজকাল। লেকিন্ এমোন হোচ্ছে কেন ? ত্বনিয়া ভর সব গরীব হোয়ে যাচ্ছে নাকি ? রাজা উজীর সব উসিকে লিয়ে গদীমে বসে আছে ? ও ঠিক নেহি গায়েন।

—সুখনজী, হামলোক তো সব মানুষ নেহি আছি। হামলোক কোই কিসিকো কেত্না দরদ দেখাছি বলিয়ে তো ? সব বেইমন হয়ে গেছি। জানোয়ার হো যাতা দিনকে দিন।

—এতো জরুর ঠিক বাত আছে। লেকিন্ এ্যাসা দিন নাই থাকবে গায়েন। রোতে রোতে পানি বিলকুল খতম হোয়ে গেলে আগ্ জ্বলে উঠ্বে। সব ত্বশমন বরবাদ হোয়ে যাবে সেদিন।

উপেনের ডেরার সামনা দিয়েই মাঠের অধিবাসীদের অনেকে চলাচল করে। এদিক দিয়ে বড় রাস্তা দোকান পাটগুলো হাতের কাছে হয়। বিন্ধেশ্বরের বুড়ী কাঁদতে কাঁদতে কোথায় গেল এই সময় কে জানে ? তার মুখে ছিল একরাশ শাপ-শাপান্ত।

বিন্ধেশ্বরের যে জেল হয়েছে তার নিজেরই অপরাধের জন্য বুড়ী সে কথা স্বীকার করে না।

—ওই দেখ গায়েন, বিন্ধেশ্বরকো সাথ্ লাইন মেনকো তো কুছ্ নেহি হোয়েছে ওহি দিন। দেশকা ঝগড়া। আরে বেকুফ, কি হোল। ছয় মাহিনা ওসকো গরাদ হোয়ে গেল গায়েন।

নন্দ ভাবে এখানে থাকতে থাকতেই একদিন হয়ত দেখবে তার ভেতর ও একটা বেকুফ জানোয়ার কারণে-অকারণে গোঁ গোঁ করে উঠছে। শরীরের সব রক্তই কবে একদিন দূষিত হয়ে গেছে। খুন খারাপি আর নষ্টামী সব তার সহ্য হয়ে এসেছে। নন্দ কি বুঝতে পারে না আজকাল মাঝে মাঝেই একটা বেত্তমিজ রাগ গরগরিয়ে ওঠে, তার ভাল মন্দ গুলো কি আশ্চর্য্য উপায়ে অগোচরে সংক্রামিত হয়ে যাচ্ছে? নন্দ বুঝতে পারে। বুঝতে পারে বলেই অস্থির হয়ে ওঠে। তাহলে আর ভবিষ্যত থাকবে কোথায়? সব যে ফক্কিকার হয়ে উঠবে, সব অন্ধকার? নন্দ কি দেখেনি কিছু মানুষের লোভ আর স্বার্থ কেমন করে মানুষকে অন্ধকারের দিকে ঠেলে দেয়! তারপর সেই অন্ধকারে খাল কেটে কি করে আরও গভীর অন্ধকার সমুদ্রে চলে যায়? সে অপরাধ কার নন্দ জানে কিন্তু সমস্ত ফল ভোগ করতে হয় ওই তার মত অবজ্ঞাত লাঞ্ছিত মানুষদের। আশাহীন, আনন্দ হীন লক্ষ্যহীন এক যন্ত্রনাময় জীবন। অথচ মানুষ বাঁচতে চায় কেন? স্বস্তিতে থাকতে আর সুখী হতেই তো? নন্দ ভাবে যেমন করে হউক সে ভালভাবে বেঁচে থাকতে চাইবে। বাঁচবার জন্যই সব কিছুর সঙ্গে লড়াই করবে। নন্দর বাবা যেমন করে চেয়েছিল। নন্দ ও চাইবে, হয়ত তার ছেলেও চাইবে।

নন্দর ছেলে? নন্দর বিস্মিত চোখ যেন মনের দিকে চেয়ে অবাক হয়ে থাকে।

—গায়েন, ওমর কত হোল? সাদী-উদী করবে না?

নন্দ সংকোচের সঙ্গে বলে—নসীব কা বাৎ সুখনজী।

সুখনরাম বলে—ও তো ঠিক। হামার নসীবেই তো হোল না সাদী-উদী। ইহা উহা ঢুড়তে ঢুড়তে আর পেটকা ধান্দায় ভগমান্ সব গাপ্ করিয়ে দিলে। বহুৎ কষ্ট হোয়েছে, বহুৎ কষ্ট হোয় গায়েন। তুমি তো আভি যোয়ান মরদ আছে, সাদী করে লাও।

নন্দ যেন বুঝতে পারে সুখনরামের জীবনের একটা গভীর কষ্টের মত কষ্ট আর কেউ পায় সুখনরাম তা চায় না। নন্দকে এই মাঠের অনেকেই কেন ভালবাসে কে জানে। হয়ত নন্দ ভদ্র শান্ত। হয়ত একটু বললেই গান শোনায়। হয়ত কারো সঙ্গেই যে তার কখনো বিরোধ বাধে না—সেই জন্য একটা সমীহ আদায় করেছে সে। তা নন্দও তো এখানে সেখানে ঢুড়ে বেড়াচ্ছে—ভগবান তো তার ইচ্ছাটাকেও গাপ করে দিতে পারেন।

সুখনরাম ফোক্‌লা মুখে হেসে বলে—সুন্দরী বিটিয়া খুব গোঁসা করে তখন চলিয়া গেল না গায়েন? হামিতে দেখলো।

নন্দ বুঝি নিজের ভেতরে সর-গর হয়ে উঠতে চায়।

—গায়েন, ও লেড়কী তোম্‌কো মহ্‌বৎ কোরে। সুন্দরী খুব ভাল আছে। হামি তো ওকে পাঁচ সাল দেখছে। তুমি ভি ভাল আছ। ওভি আছে। আচ্ছা হোবে। সুন্দরীকো সাদী করলোও গায়েন?

—সুখনজী, ও লেড়কী কাল-নাগিনী আছে।

সুখনরাম ফ্যা ফ্যা করে হেসে উঠে বলে—সাচ্। সুন্দরী বিটিয়াকো বহুৎ ঝাল আছে। ও কোই দুষমনকেও পারোয়া করে না। তব শুন……

কিন্তু সুখনরামের কথা থেমে যায়। মহেশ সামন্ত ভাঙ্গা-চোড়া একটা যন্ত্রের মত দিক-বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে চলেছিল তার ডেরার দিকে। সুখনরামের ডাক্ শুনে ফিরে চায়, এগিয়ে এসে ধপ করে বসে পড়ে মাটিতে।

—বলো দেখি ভাই ভগবানের একি বিচার? সাধ করে কি আর গরীবের ঘরে জন্ম নিয়েছি? ভগবান, তুমিই তো পাঠিয়েছ তবে এত হেনস্তা কেন? সকলেই ভাল খাবে ভাল থাকবে, আমরাই শুধু রোগে ভুগে ভুগে মরব নাকি। আমি খুন করব খুন করব শালার ডাক্তারকে। শূয়ারের বাচ্চা কষাই একটা।

—কি হোল মহেশ ভেইয়া। লেড়কা কেমোন আছে।

মহেশ সামন্ত ভেউ ভেউ করে যা বললে তা হল ছেলেটা কেমন করছে দেখে ডাক্তারের কাছে গিয়েছিল। মাঠের ডাক্তার বাবু কোথায় যেন বেড়াতে গেছে। পাশের ছোকড়া ডাক্তারকে বলতে সে বললে আগে ফি দাও, তারপর দেখা যাবে। হাতের কাছে ফি কোথায় পাবে মহেশ সামন্ত? ফলে যা চিরকাল হয়ে আসছে, তাই হয়েছে। বলতে বলতে মহেশ সামন্তের পিতৃ হৃদয় হু হু করে চোখের জলে আকুল হয়।

—রো মৎ ভেইয়া। এহি হ্যায় হামাদের নসীব।

মহেশ কাঁদতে কাঁদতে বলে—গায়েন বলো দেখি, গরীবের কেন ছেলে পুলে হয়? হ্যায়! ভগবান তোমার কি কোথাও নিয়ম নেই? গরীবরা কি তোমার কেউ নয়?

মহেশের আকুলি বিকুলি দেখে নন্দর নরম মনটা একেবারেই যেন ভিজে ওঠে। গরীব বলেই কি আর সাধ আহ্লাদ থাকবে না? দেহ ধর্ম কাজ করবে না? আশা আকাংখা তো মানুষেই করে? কি গরীব কি ধনী? নন্দ ও তো তাই চাইছে। কিন্তু কেমন করে হবে তা? কোথাও একটা গরমিল যে কিছুতেই শেষ হতে চায় না। মানুষের লোভ যে মানুষকে নিষ্ঠুর করে তোলে, মানুষ যে দয়ামায়া ভুলে যায় তখন?

নন্দ তার আজকের রোজগারের টাকা থেকে দুটো টাকা বের করে মহেশের হাতে দিয়ে বলে—টাকা দুটো নিয়ে ডাক্তারের কাছে যাও মহেশ খুঁড়ো। ছেলেটাকে দেখাও।

মহেশ ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে থাকে। এই মাঠে এমন হৃদয়বৃত্তির মানুষও আছে তাহলে? বলে—তুমি দিচ্ছ গায়েন?

—তোমাকে দেবার মত আমার ছিল যে মহেশ খুড়ো। যাও, ছুটে চলে যাও।

মহেশ লাফ দিয়ে উঠে ছোটে ডাক্তারের কাছে। সুখনরাম বলে—ভগমান তোমার মঙ্গল করবে গায়েন!

ভগবানের নাম শুনে জীবনে এই প্রথম নন্দর মুখে একটা বিদ্রূপের হাসি ফুটে ওঠে। আর ভগবান। ভগবান থাকলে এসব হয় নাকি পৃথিবীতে। ভগবান কি তার নিজের হাতেই নিজের গুষ্টির পিণ্ডি চটকাতে পারত এমন করে? ফুঁ যত সব ছেঁদো কথা?

রেলওয়ে কোয়র্টার্সে একটা মানুষের হাত দ্রুত লিখে চলেছে তখন—কে বলে ওরা মানুষ নয়। দূরে প্রাসাদের উপর বসে নাক সিটকে তোমরা বলবে—ওরা মানুষ নয় তাই কি বিশ্বাস করতে হবে! বিশ্বাস করতে হবে তোমাদের স্বার্থবুদ্ধি প্রনোদিত ভণ্ডামীকে? বলো কোথায় এরা তোমাদের মত মানুষ থেকে ছোট এবং অকৃতার্থ? সমাজ পরিবেশে? কিন্তু এই সমাজ পরিবেশ কারা সৃষ্টি করেছে কারা তাদের লোভের অমানুষিক জিব্‌টাকে লকলকে করে তুলে তিনভাগ পৃথিবী জুরে এই নরক গড়ে তুলেছে? তোমরা তোমাদের সুখের জন্য এদেরকে হাতিয়ার করে তুলেছ; ক্লেদাক্ত অন্ধকার দিয়ে ওদের দৃষ্টিকে আচ্ছন্ন করে রেখেছ, অপুষ্টি দিয়ে অশক্ত করে রেখেছ। মৃত্যুর কি ভয়ানক নগ্ন রূপ এনে দিয়েছ তাদের জীবনে। তোমরাই করবে মানুষের দাবী আর ওরা মানুষরূপী জীব হয়ে চিরকাল রোগে শোকে অভাবে বঞ্চিত হয়ে হয়ে একদিন মরে যাবে তাই মানতে হবে নাকি ইতিহাসকে? এই কথাই কি মানাতে হবে স্নেহ-মমতা দয়া-মায়া বাঁচবার সাধ আহ্লাদ তোমাদের চাইতে ওদের কম? মানতে হবে নাকি?

কানাই মান্নার বুকের ভেতর একটা যন্ত্রণাদায়ক পোঁকা কুটুস-কুটুস করে দাঁত কাটে। মাঝে মাঝে শূণ্যে ঘুসি ছুড়ে দিয়ে মান্না বলে —নিকুচি করেছে ঘর সংসার। বেশ তো চলে যাচ্ছিল খোঁদার ষাড় হয়ে। এমন জানলে কোন শালা হাঁড়িকাঠে যেত? এখন আমি করি কি রে অটুলা। ওই ছাখ, বজ্জাৎ আবার খিক্‌খিক্ করে হাসছে।

গাঁজার কলকেতে দম্ দিয়ে অটল বলে—নে একটা দম দিয়ে নে, সব ঠাণ্ডা হয়ে যাবে। আরে বাওয়া, ওই যে বাবুরা বলে আমরা হচ্ছি সমাজের বিষাক্ত ফোঁড়া। আমাদের ওই সব ভদ্দরলোকের রোগ কেন? তোকে পই পই করে না করেছি না?

—শালা রামকেষ্ট এল রে।

—তবে খাবি খা বসে বসে।

—ওরে ছলে, তুই শালা বল্ দেখি, মানা করলেই মন মানে নাকি?

ছলে ভারিক্কি চালে বলে—তা মানছে না বলেই তো এত ঝক্‌মারি। এযে বাবা ছেরেপ পেরেম। ওই যে এংরেজীতে বলে লাফ না কি? হ্যারে কানাই তুইও তো ছ' একটা লাফ্ টাফ্ মারতে পারিস।

কানাই দাঁত কড়মড়িয়ে বলে—শালীকে একবার জুত্‌মত পেলে ওর নাক্ সিটকানো বের করে দিতাম না।

—দাঁড়া! দাঁড়া! বাপটা মরল বলে তো।

—আর এক বাপ আছে না? মাঝে মাঝে ইচ্ছা করে উপেন বেটাকেই সাবাড় করে দিই। খোঁড়া, সুন্দরীর জন্য তোর এত আলগা দরদ কেন রে? সম্বন্ধীর পো, তুই তো আর গিয়ে তার বর হতে পারছিস না?

—পেয়ারের লোক হবে। গায়েনের সঙ্গে যেন জমে যাচ্ছে মনে হচ্ছে রে কানাই? ও বেটা সনাতন খুড়োকে হরির নাম শোনাতে যায়। শালা যার জোটে তার সবই জোটে।

কানাই তার চওড়া পাথরের মত বুকে দড়াম করে একটা চাপড় মেরে নেকড়ের মত জ্বলজ্বলে চোখে বলে--আমি বদলা নিয়ে নেব। শালা জরুর নেব। আমি এসপার নয় ওসপার করে দেব।

অটল বলে—তা তোর বিয়ে করার সখ এত চাগিয়ে উঠল কেন রে? করবি তো করবি সুন্দরীকে কেন? আর মেয়ে নেই মাঠে? সাঙা করবি তো বউ-ফউ নেই! দাঁত্লী খেঁদিকে করনা। তার চোখ তো তোর দিকে চেয়ে জুলজুল করে।

—থাম্ দেখি, বাজে বকিস না। ধমকে থামিয়ে দিয়ে কি যেন ভাবতে থাকে কানাই। মনে মনে কি একটা মতলব আটতে থাকে সে।

—কি রে, কি করছিস তোরা। বলতে বলতে অন্ধকার থেকে সত্যপ্রিয় চৌধুরী এগিয়ে আসেন আলোকিত দরজার সামনে।

কানাই ওরা যথেষ্ট সমীহ করেই উঠে বসে—এই যে, আসুন চৌধুরী বাবু।

—তোদের খবর কি? সব ঠিক চলেছে তো?

—বেঠিক আর কবে হল চৌধুরী বাবু? আপনার আশীর্বাদে আট ঘাট আমাদের বাঁধাই আছে।

সত্যপ্রিয় চৌধুরী চারিদিকে একবার চেয়ে বলেন—এবারের কাজটা খুব ভাল বুঝলি। দেখবি দু'হাত ভরে যাবে।

অটল মনে মনে বলে,—সম্বন্ধীর পো, দুহাত কার ভরছে তাকি আর আমরা জানিনে?

চৌধুরীবাবু বলেন—তোরা তৈরী থাকিস, আমি ঠিক সময়ে খবর দেব। কানাই আয় আমার সঙ্গে, তোদের পার্বনীটা নিয়ে আসবি।

কানাই চলতে চলতে বলে--আপনাকে একটা বুদ্ধি দিতে হবে চৌধুরী বাবু?

—আয়! আগে সনাতনকে একবার দেখে আমি। তার পর শুনব তোর আবার কি বুদ্ধির দরকার পড়ল।

দিন তিনেক পর হঠাৎ নন্দর সঙ্গে দেখা হতেই কানাই বিনয়াবতার হয়ে ওঠে। গুনমুগ্ধ ভক্তের মত অনুনয়ের কণ্ঠে বলে —গায়েন, আজ পেয়েছি তোমাকে। আজ আর ছাড়ছি না। এস, একটু গান শুনব। না, না আজ তোমাকে শোনাতেই হবে গায়েন। আমরা কুলি মুজুর বলে বুঝি সখ নেই।

লাজুক নন্দ এরপর আর পেরে ওঠে নি কানাই-এর সঙ্গে। গান গেয়েছে। একটা দুটো করে অনেক গুলো। তার পর তেলে ভাজার দোকান থেকে আনা খাবার খেতে খেতে ভেবেছে মিথ্যাই কানাইকে খারাপ ভেবে এসেছে নন্দ। উপেনদা মিছামিছিই তার উপর খাপ্পা হয়ে আছেন।

—বড় ভাল গাও তুমি গায়েন। শালা আমাদের কিছুই হল না? না ডালে না ঝোলে। তা রোজগারপাতি নিশ্চয়ই ভালই হচ্ছে, কি বল?

—রোজগার বড় খারাপ কানাইদা।

—দিন কালের যা অবস্থা, রোজগার বাড়াও গায়েন। এই তো বয়েস, বিয়ে সাদী আছে, ছেলে পুলে আছে, ভবিষ্যত আছে।

—কি করব। কাজ যে কিছুই জানি না।

—আরে ছেঃ। কাজ জানলেই টাকা রোজগার হয় আর না জানলে হয় না নাকি গায়েন? তুমি হাসালে বাবা। কিছু না জেনেও কত রোজগার করতে চাও বলো দেখি! বিলকুল বিনা পরিশ্রমে।

—তাও হয় নাকি কানাইদা?

—হয় গায়েন হয়। তবে কিনা ব্যাপারটা গোপন রাখতে পারলেই রোজগারটা বেশী হয়। অন্যেরা আর ভাগ বসাতে পারবে না। আমরা তো বুড়ো-হাঁবড়াই হয়ে গেলাম ধরো। আমাদের আর কি আছে। তোমাকে দেখে কেমন মায়া হয়। ছোট ভাই-টাই থাকলে তোমার মতই তো হত সে বেটা?

কানাইএর কথায় নন্দর ভেতরে ভাবপ্রবনতার খানিকটা জোয়ার উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে। নিজের মনেই ছিঃ ছিঃ করে নন্দ। না, মানুষকে না জেনে কিছু ভাবতে নেই ?

ছুলে অটল নন্দর অলক্ষ্যে কানাই-এর দিকে চেয়ে মনে মনে এঙ্কোর এঙ্কোর বলে বাহ্‌বা দিয়ে ওঠে। বেটা বজ্জাৎ যেন ঘুঘু পাখীর মামা !

—তা কাজটা কি কানাই দা ?

—তেমন কিছু নয় খুব সহজ। পরে বলব। তবে কাউকে বলে ফেললে তা আর হবে না গায়েন। চারিদিকে তো শকুনীর দল। কাজের দিন তোমাকে নিয়ে যাব। মাত্র একঘণ্টা লাগবে, কিন্তু তোমার পকেট ভরে উঠবে এত্তো টাকায়। তখন বুঝবে আমার কথা সত্যি কিনা ? কি, রাজী গায়েন ?

নন্দ তখন আবিষ্ট হয়ে তার ভবিষ্যতের কথা ভাবছিল। কোন অভাব অভিযোগ নেই তার সংসারে। কম পরিশ্রমে অনেক টাকা রোজগার করছে নন্দ। সুন্দরী বউ হয়ে ঘুর ঘুর করছে ঘরে-বাইরে। উপেনদা ছেলে পুলেদের সঙ্গে খেলা করছে। আঃ কি সুখ ?

—কানাইদা আমি রাজী ?

- বেশ, তোমাকে ঠিক সময়ে খবর দেব গায়েন।

সেদিন নন্দ চলে গেলে অটল আর ছুলে কানাই-এর পায়ে সষ্টাঙ্গে শুয়ে পড়ে বলে—তুই গুরু লোক কানাই। তোর মাথায় যে এত বুদ্ধি আছে কে জানত ? শালা কম পরিশ্রমে টাকা রোজগার করবে।—বলে ওরা এমন শব্দ করে হাসতে থাকে যে, গাছের নীচে জমাট বাঁধা অন্ধকার ও যেন চমকে চমকে উঠতে থাকে।

—ঘুঘু দেখেছে, ফাঁদ দেখেনি তো।

—পিরীতের কি জ্বালা এবার বুঝবে বাছাধন ?

—হ্যাঁরে কানাই, একেবারে সাবাড় করে দিবি নাকি ?

কানাই তখন গাঁজার কলকেতে মাল টিপতে ব্যস্ত। ভাবে, শালার সুখ! সুখ কি জিনিষ কে জানে? সুখের কথা মনে হলে মনেব ভেতরটা এমন কুকুরের বাচ্চার মত কাই কাই করে ওঠে কেন? বোধ হয় মনের মত করে যা চায় সেই সুখ পেলে খুবই ভাল লাগে। ছুনিয়া শুদ্ধ সব বেটাই তো সুখের জন্য ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে—এর তার সাজানো বাগানে ছাগল ঢোকাচ্ছে। কানাই ও তার সুখের জন্য কিছু করবে বৈ কি? এতদিন সুখ ছিল অন্য খানে। আজ সুন্দরীকে নিয়ে ঘর বাঁধার সুখ। আজ সুন্দরীর ওই টই-টুম্বুর বুক আর ভারি পাছার পাত্‌লা পাত্‌লা শরীরটাকে শরীরের আগুন জ্বালা অন্তরঙ্গ আবেষ্টনীতে এনে পিষে পিষে কাঁদা করে দিতে না পারলে সুখ কোথায়! অটুলা শুয়ারের বাচ্চা বলে —সুন্দরী নাকি তার মেয়ের বয়সী। আরে শালা, রাখ তোর ধম্ম কথা।

আত্মরতির নেশায় কানাই তখন লাগাম ছেঁড়া স্বপ্নের হাত ধরে চলতে থাকে।

—ভগবান, আমার কি হবে? আমার এমন কেন করলে?

ঘরের আলোটাকে একেবারে শেষ বিন্দুতে নিবু নিবু করে সনাতনের মাথার কাছে বসেছিল সুন্দরী। এখন আর আলো সহ্য করতে পারে না—সনাতন। চোখে লাগলে চেঁচায়, গালি-গালাজ করে। মানুষটার মতি গতির ঠিক ঠিকানা পাওয়া দায় হয়ে উঠেছে আজকাল।

এখন না আছে দিন না আছে রাত সুন্দরীর। কখন যে খায় কখন ঘুমোয় কিছুরই ঠিক নেই। সমস্ত কাজকর্মের ভেতর ওই একটা চিন্তাই ঘুরে ফিরে মনে আসে। জীবন যে এত যন্ত্রনাদায়ক সুন্দরী জানত না এর আগে। কান্না-ব্যাকুল দকচানো মনে

উদ্ধারের আশায় হাত বাড়িয়ে বাড়িয়ে এক সময় ফিরে আসে। কোথাও কোন আশার আলো দেখতে পায় না। ভয়! চারিপাশে কি অনন্ত ভয়? গাছের ছায়ায় ছায়ায় জমাট বাঁধা পিশাচ শরীর নিয়ে অন্ধকার রাত্রি আর কতগুলো ক্ষুধার্ত জন্তুর ফিসফিসানীর মতই বিভৎস একটা সর্পিল ভয় হিস্ হিস্ করে তার সমস্ত শরীরে চলা ফেরা করে। কান্না পায়; শরীরে জ্বালা ধরে, রাগ হয়। কখনো তার সোমত্ত বয়সের দেহে, বুকে, তলপেটে কি একটা গভীর দুঃখ বসে বসে অশ্রুজল ফেলে।

—ভগবান এমন কেন করলে? আমি কি করেছি। আমার যে ঘুম নেই চোখে, ক্ষিধে নেই পেটে, তস্ নেই শরীরে। যে দিকে তাকাই; সব এত অন্ধকার করে দিলে কেন? ভগবান, আমি বাঁচব কি করে? আমি যে বাঁচতে চাই? আমি যে কিছুই পেলাম না ভগবান?

রাত্রির অন্ধকারে শুয়ে বশে এখন প্রায়ই এমনি বুট্ বুট্ করে সুন্দরী।

—সুন্দরী! ও সুন্দরী, হারামজাদী গেলি কোথায়?—সনাতন প্রথম ডাকে সাড়া না পেয়ে তিরিক্ষে হয়ে ওঠে।

সুন্দরী তার সচেতন মনে ফিরে এসে ব্যস্তভাবে বলে—এই তো বাবা আমি। তোমার মাথার কাছেই বশে আছি।

— বসে আছিস না ছাই। তুই মতলব করছিস বাপটাকে কি করে ফেলে পালাবি? আমি বুঝি না ভেবেছিস! যে আসে তার সঙ্গেই তোর ফিস্-ফাস্ গুজ-গুজ কেন বুঝি না? আমি বুড়ো হাঁবড়া হলাম, আমি বুঝি না। ছিনালী! ছিনালী হবি। যা, যা বেরো রক্তখাকী?—বলতে বলতে হেঁদিয়ে ওঠে সনাতন, বুকটা হাঁপড়ের মত ওঠা নামা করে; গলার ভেতর গর-র গর-র করে শব্দ হতে থাকে।

এই আর এক উপসর্গ সনাতনের—কেবল সন্দেহ। সুন্দরী

জলভরা আবছা চোখে সনাতনের বুকে হাত বুলাতে বুলাতে বলে—বাবা চুপ কর। চেঁচিয়ে কথা বল্লে মরে যাবে যে তুমি?

—তুই তো তাই চাস আমি মরি। আমি বুঝি না। তারপর কনাই-এর সঙ্গে পালাতে পারবি। ওরে রক্তখাকী শাকচুন্নি তুই মরলি না কেন?

—বাবা চুপ কর।

—তুই দেখিস, আমি—আমি মরবার আগে তোকে মেরে তবে মরব।

সুন্দরীর মুখে হাসি ফোটে এবার, বলে—তাই করো বাবা; তাহলেই যে বেঁচে যাব আমি। উদ্ধার পেয়ে যাব এই নরক থেকে। আমার কষ্ট তুমি বুঝবে কি করে।

তারপর সনাতন উত্তেজনার ক্লান্তিতে এক সময় নিঝুম হয়ে গেছে। সুন্দরীর মনে হয় যতদিন সনাতন দাড়িয়ে ছিল, সে ছিল যেন একটা বড় গাছের নিচে। রোদ জল ঝড় কোন কিছুই গায়ে লাগতে পারে নি। কি নিশ্চিন্ত ছিল? আজ নিরাশ্রয় হবার আভাস দেখা দিতেই চারিপাশে কি কুটিল অন্ধকার ঘনিয়ে এল। কোথায় যাবে সুন্দরী, কি করবে? কেমন করে আত্মরক্ষা করবে সে? কেমন করেই বা তার সাধ আহ্লাদের প্রতি ভগবান মুখ তুলে চাইবেন। সুন্দরী বোঝে বৌদিদি তাকে বেশী দিন বাড়ীতে রাখবেন না—কোথায় কোন গাঁয়ে তার মায়ের কাছে পাঠিয়ে দেবেন। মাষ্টারদা তো তাকে স্নেহই করেন—সে থাকলে তো কাজ কর্মেরও কত সুবিধে হত তাদের। তবে?

সুন্দরীর মনে পড়ে বৌদিদি সেদিন বলেছিলেন—দেখ্ সুন্দরী পুরুষ মানুষকে কখনো বিশ্বাস করবি না। হাতের দশটা আঙ্গুলে শক্ত করে বেঁধে রাখবি। একটুও আল্‌গা দিবি না। কিন্তু ভাবে ভঙ্গিতে দেখাবি তোর বিশ্বাসের যেন গাছ-পাথর নেই।

সুন্দরী যেন বোঝেনি এমনই ভান্ করেছিল। বুঝলে হবে

কি? সেটা ছাড়া সুন্দরীর আর আশ্রয়ই বা কোথায়? সুন্দরী বুঝতে পারে ভদ্রলোকের সঙ্গে থেকে থেকে সেও অনেক নিয়ম নীতির শেকল পড়ে ফেলেছে পায়ে। এখন আর মাঠের জীবনটাতে মহড়া নিতে মন সায় দেয় না; মাঠের চাওয়া-পাওয়া ও আর দাগ কাটেনা শরীরে। সুন্দরী বুঝি চায় একটা সুস্থ জীবন, সে বুঝি চায় সামাজিক নিয়মে বাধা একটা সংগঠিত আবেষ্টনীর ভেতর নিজের মনের প্রতিরূপ নিয়ে বাঁচতে। কিন্তু কে দেবে সুন্দরীকে সেটা? ভগবান তো জন্মলগ্ন থেকেই বিরূপ হয়ে আছে। মানুষ নিষ্ঠুর স্বার্থপর। কেড়ে নিতে না পারলে এখানে কেউই যে হাতে ধরে কিছু দেয় না। পৃথিবীময় কেবল যে জোরেরই নিয়ম দেখতে পায় সুন্দরী? কেবল জোর আর জবরদস্তি?

—সুন্দরী আছিস্ না কিরে।—বলতে বলতে সত্যপ্রিয় চৌধুরী নিচু হয়ে ঘরে ঢুকে বলেন—এই যে, সনাতন কেমন আছেরে আজ।

—ভাল নয় চৌধুরীবাবু। ছট-ফটানিটা বেড়ে যাচ্ছে।

—রবীন ডাক্তারকে তো আমি বলে দিয়েছি। সে দেখে টেকে ঔষুধ পত্র দিচ্ছে তো ঠিক?

—এতদিন তো তাই হয়েছে। এখন যে আর ডাক্তারবাবুর আট-আনা পয়সাও দিতে পারব না। আমাদের যে আর কিছুই রইল না চৌধুরীবাবু?

সত্যপ্রিয় সান্ত্বনা দিতে চেষ্টা করেন সুন্দরীকে, বলেন—আরে, অত ভেঙ্গে পড়ছিস কেন?

সুন্দরী ঘুমন্ত সনাতনের মুখের দিকে সজল চোখে চেয়ে চুপ করে বসে থাকে।

সত্যপ্রিয় চৌধুরী সমব্যথীর কণ্ঠে বলেন—তাই তো ভাবি মাঝে মাঝে, সনাতন যদি তোকে বিয়ে দিয়ে যেতে পারত, তবে সনাতনও নিশ্চিন্তে মরতে পারত, তোর ও ভাবনার থাকত না কিছু। দেখ না কি হয়। আমার বাড়ী তো রইলই। সেখানে থাকবি খাবি..

কাজকর্ম করবি। শুনেছি তুই নাকি ভারী কাজের লোক। তোকে পেলে তো আমি অনেক নিশ্চিন্ত হয়ে যাব।

সুন্দরী সত্যপ্রিয় চৌধুরীকে এক পলক দেখে চুপ করে থাকে।

—সত্যপ্রিয় এক সময় বলেন—হ্যাঁরে সুন্দরী, কানাই তো যোয়ান মরদ, রোজগার পাতি ও করে ভাল। তা তুই যদি রাজী থাকিস্, আমি বলে কয়ে দেখি।

এক ঝলক রক্ত সুন্দরীর বিষাদ-ক্লিষ্ট মুখেও ছড়িয়ে পড়ে। রক্তের রং দেখে মনে হয় না সেটা অনুরাগের রং। বলে—আপনি এমন কথা আর বলবেন না চৌধুরীবাবু ?

—কেন ? কেনরে ?—সত্যপ্রিয় ব্যস্ত হয়ে ওঠেন।

—কানাই মান্না যে আমার কাকার বয়সী ?

ঘরের পেছনে অন্ধকারে ভূতের মত দাড়িয়ে ছিল আর ভেতরের মানুষগুলোর কথাবার্তা শুনছিল কানাই। এবার সে সামনের গাছটায় একটা ঘুষি মেরে দাঁত কড়মড়িয়ে মনে মনে বলে—হারামজাদী, একবার কায়দা মত পেলে হয়। তোর দফারফা করে ছাড়ব। খুন, খারাবি করতে হয় তাই করব। কিন্তু তোর রক্ত খাবই খাব শালী ? তবে আমার নাম কানাই মান্না।

সুন্দরীর কথা শুনে সত্যপ্রিয় হেসে উঠেছিলেন। বলেন কাকার বয়সী লোক খারাপ তোকে কে বল্লে ?

—খারাপ কে বলে। আমার ভাল লাগেনা।

—তোর আবার ভাল খারাপ কি রে ? একটা হিল্লে হলেই তো হল ?

সুন্দরীর চোখ কড় কড়ে হয়ে ওঠে। বলে—আপনারা তো ভদ্রলোক। আপনারা আমাদের জন্তু জানোয়ার ভেবে যা খুসী তাই বলেন।

—ওরে বাবা, আত্মসম্মান তো তোর খুব দেখি সুন্দরী ? তা

তুই করবি কি। সনাতন আর বেশীদিন নেই, ওর তো হয়ে এসেছে। আমি তো সবদিক ভেবেই বললাম। যোয়ান মরদ, কামায় ও ভাল। তোর গতি ভালই হতো।

অশিক্ষিতা সুন্দরী কেমন করে যে এখন মুহূর্তের ভেতর সত্যপ্রিয় চৌধুরীর আসল উদ্দেশ্যটা বুঝতে পারে তা নিজেও জানে না। শুধু মনে হয় লোকটা কি নোংরা। তাহলে লোকে যা বলে তার কিছু সত্য বটে? উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য সনাতনের হয়ে এসেছে বলে ভয় দেখাতে আর বলতে এতটুকু তো বাঁধ্‌ল না তার। সুন্দরীর ইচ্ছা হয় কাঁমড়ে খাম্‌চে ওর ঠোঁট্‌ দুটি ছিঁড়ে ফেলে দেয়? ভদ্রলোক! ভদ্রলোক কি কম দেখেছে সুন্দরী? কত ভদ্রলোকের চর এসে কত লোভ দেখিয়ে ফিরে গেছে, সাড়ী, গয়নার টোপ ফেলেছে। বলেছে বউ-এর মত থাকবি। না হয় সপ্তাহে একবার, দু'বার করে যাবি। কিচ্ছু হবে না তোর। যেমন ছিলি তেমনই থাকবি। দু'হাত ভরে যাবে তোর। সয়তানের বেটা সব—সুন্দরী ভাবে। উপরটাই শুধু সুন্দর করে সাজিয়ে গুছিয়ে রাখে—ভেতরে সব ভাগার জমিয়ে রেখেছে। নোংরামী যেন শুধু এই মাঠের জীবন গুলোকেই গ্রাস করে ফেলেছে, পৃথিবীময় যত ভাল আছে, সব ভালর গলা যেন এই নিচুতলার মানুষগুলোই টিপে ধরে আছে? আর কোথাও যেন মন্দ নেই, দুর্নীতি নেই, ভণ্ডামী নেই? পশু প্রবৃত্তির হাত ধরে সামাজিক নিয়ম রুচির চোখে যেন ঠুলী পরিয়ে দেওয়া হয়নি ভদ্র সমাজে শিক্ষিত সমাজে? কপট, ভণ্ড, ফোঁপর দালাল সব। তোদের মুখে থুথু দি। থুথু দি।

রাতে খেতে ইচ্ছা করছিল না বলে মাষ্টারবাবুর বাড়ী থেকে আনা খাবারগুলো চারুকে দিয়ে আসে সুন্দরী। শশী আর চারু গালে হাত দিয়ে বসেছিল; একটা ছেলে চ্যাঁ চ্যাঁ করে কাঁদছিল। সুন্দরী দেখেই বোঝে আজ হাঁড়ি চড়েনি তাদের।

—তুই খেলিনা কেন রে?

—শরীর ভাল লাগছে না চারুদি। তোমরা উপোষ থাকবে নাকি আজ ?

—কে জানে কয়দিন থাকতে হবে রে সুন্দরী। দিনকাল যে কি খারাপ হয়ে গেল। বলে শশী একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে।

—শশীদাদা শোন তো, আমাদের ঘরে কয়েক মুঠো চাল পড়ে আছে। কে আর খাবে এখন ?

চারু বলে—আজ থাক্‌রে। কালও যদি কিছু উপায় না হয় তখন নিয়ে আসব। হায়রে, কি পাপ করেছিল্লাম।

কে জানে পাপ কিনা ? সুন্দরী জানে না। মাষ্টার দা সেদিন কাকে যেন টেবিল চাপড়ে বলছিলেন—এ পাপ নয় শাপ ও নয় বুঝলে। এ এক ধরণের মানুষের বেয়াদপি, বজ্জাতি। নিষ্ঠুর পাশবিক আত্মসন্তুষ্টির চরিতার্থতা। ওদের জঘন্য ভোগ লালসার চক্রান্ত। ওদের লালসায় মনুষ্যত্বকে জঙ্গলের আদিমতার দিকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে দিনের পর দিন।

সুন্দরীর সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ে গিয়েছিল সেই লালসার ঘটনাটাকে। যেমন প্রায়ই মনে পড়ত এক একবার। যেন তার দেহের ভেতরকার উপছে পড়া ভোগ-সুখের ইচ্ছাটাই তাকে মনে পড়িয়ে দিয়ে যেত।

এই তো সেদিন সন্ধ্যার ঘোর ঘোর লাগা বিকালে নদীর পারে গিয়েছিল সুন্দরী। বিকালের দিকে নদীর পারের ফাঁকা জায়গায় অনেকেই বেড়াতে আসে। উঠ্‌তি বয়সী তরুণ-তরুণীর ও ভীড় কম হয় না। ফষ্টি-নষ্টি ও কি আর কম চোখে পড়েছে সুন্দরীর। সেদিন কেন জানি সে শশ্মানটার দিকেই চলে যায়। ওদিকে ঝোপ্‌ ঝাড় বেশী, ছম-ছমানো নির্জনতা, মানুষজন পারত পক্ষে ওধারে ঘেষে না বড় একটা। সুন্দরী লতায় পাতায় ছাওয়া ডুমুর গাছটার পাশ দিয়ে ওপাশের আড়ালটার দিকে পা' বাড়াতে গিয়েই থমকে থেমে পড়ে। ঝোপের ওপাশে কারা কথা বলছে যেন ? সুন্দরী

পা টিপে টিপে বনবিড়ালীর মত এগিয়ে গিয়ে ঝোপ্ সরিয়ে চোখ ফেলেই থত মত খেয়ে যায়।

সুন্দরীর মতই দুটি ভরা বয়সের ছেলে মেয়ে বসে আছে। অবস্থাপন্ন ঘরের ছেলে মেয়ে বলেই মনে হয় তাদের। ছেলেটি কখনো মেয়েটিকে কাঁতু কুতু দিচ্ছে, কখনো একটু আদর করছে আর সব কিছুর ফাঁকে ফাকেই ছেলেমানুষের মত আঁচলটা ফেলে দিচ্ছে; কাপড় ও জামাটাকে নিয়ে টানাটানি করছে। মেয়েটি হাসছে, বাধাও দিচ্ছে কিন্তু ছেলেটিকে প্রলুব্ধ ও যেন করছে। কখনো দেখা গেল মেয়েটির মুখের উপর ছেলেটির সবেগ তীর্য্যক আদর যখন লক্ষ্য ভ্রষ্ট হল না তখন মেয়েটিও দু'চোখ বুজে নিশ্চিন্ত আস্বাদের কাছে আত্মসমপর্ণ করে দিয়ে সেই উদ্বেল ঝড়কে নিজের শরীরের ডালা-পালা ভাঙ্তে দিতেও বিরূপ হয়ে উঠছে না।

—এই কি হচ্ছে অসভ্য কোথাকার?

—কি আবার হবে, যা চিরকাল হয়ে আসছে।

—তুমি বড্ড বাড়াবাড়ি করছ?

—এটা হচ্ছে স্থান-মাহাত্ম্য!

—সয়তানরা এই সব জায়গারই খোঁজ রাখে বেশী।

—নির্জনতা আর সয়তান, এই দুটোর হাত থেকে আজ বাঁচতে পারলে হয়।

—বিপুল না, আর বাড়াবাড়ি করবে না।

—বুঝলে এখন সব কিছু ভাঙার দিন, চুড়মার করে ফেলার দিন। নীতির দোহাই মেনে মেনে আর কতকাল ভুগতে হবে?…

—এই না, কি হচ্ছে? না না।—মেয়েটির কণ্ঠে যেন একটা ভীত আর্তনাদ চিড়্ খেয়ে ওঠে। একটু পরেই অবশ্য মেয়েটি খিল্ খিল্ করে হেসেও ওঠে।—ফাজিল, কি ভয় পাইয়ে দিয়েছিলে? যা করছ তাতেই সন্তুষ্ট থাক। আর বেশী এগিয়ো না বিপুল।

সুন্দরীর গলা শুকিয়ে দম বন্ধ হয়ে আসছিল। বুকের কাপনের

সঙ্গে সঙ্গে শ্বাস-প্রশ্বাসও কেঁপে কেঁপে উঠছিল। মনে হয়ে ছিল হাত, পা' শরীর সব যেন অবশ পঙ্গু হ'য়ে গেছে। বুঝতে পেরেছিল সমস্ত শরীরের ভেতর কি ভয়ানক একটা তাপ্ তাকে পুঁড়িয়ে পুড়িয়ে ছাই করে দিচ্ছে। পালাতে চাইছে কিন্তু পালাবার শক্তি নেই। দেখতে চাইছে না কিন্তু না দেখে সরে যেতে ও পারছিল না সুন্দরী। শুধু মনে হচ্ছিল মানুষের শরীরে ভগবান কি বিষই না ঢেলে রেখেছেন?

—এই বিপুল, রাগ করলে নাকি?

বিপুল চুপ।

—এই আমার দিকে ফেরো।

—চলো বাড়ি যাই। সন্ধ্যা হয়ে আসছে।

—আগে আমার দিকে ফেরো। আচ্ছা বলতো, কি আর বাকী রেখেছো? যেটুকু আছে তাতে যে বিপদ হতে পারে?

—আজকের দিনে ওসব আবার বিপদ নাকি?

—না বিপুল, না।

সুন্দরী পাতার আড়াল থেকে এবার দেখতে পায়; মেয়েটির কোমড় পর্যন্ত প্রায় বলতে গেলে বে—আব্রুই হয়ে আছে এখন। সেদিকে লক্ষ্য নেই মেয়েটির, তেমনি বসে বসেই সাধা-সাধনা করছে ছেলেটিকে। তারপর ছেলেটি কিছু বলবার জন্য ফিরে বসতেই মেয়েটি ঝট্ করে তার হাটুর উপর ভর দিয়ে সোজা হয়ে বসে ছেলেটির মুখটাকে যেখানে টেনে আনে তা দেখে সুন্দরীর সমস্ত শরীরের রক্ত টন টন করে। ছেলেটি যেন জোয়ার জলের মতই উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে, ভেঙ্গে ভেঙ্গে পড়তে থাকে।

সেদিন সুন্দরী অনেকক্ষণ ডুবিয়ে ডুবিয়ে স্নান করেও তার শরীর থেকে আগুনে আবহাওয়াটাকে তাড়াতে পারেনি? শুয়ে শুয়ে, বসে বসে সারারাত শুধু দুঃস্বপ্ন দেখেছে সুন্দরী। সারারাত শুধু তার মনটা ছুটে ছুটে চলে গেছে উপেনের ডেরার দিকে। পাথর!

পাথর। বোকা গর্দভ একটা। কত মানুষ বুঝতে পেরে গেল আর সেই হোঁদল কুৎ-কুতের সাড় নেই? মানুষের রক্ত আছে নাকি ওর গায়ে। তেলেপোকা ছুঁচো একটা।

কিন্তু দেহ-মনের আশা আকাংখার আঘ্রাণ নেবে বসে বসে এখন অবস্থা নয় সুন্দরীর। তার অস্নাত অভুক্ত নিদ্রাহীন ক্লিষ্ট দেহ-মনে যেটুকু উদ্বেগ—আকুল হয়ে ওঠে সেটা বিরক্তি আর বিরূপতাই সৃষ্টি করে। কানাইকে তার খুন করতে ইচ্ছা করে। ইচ্ছা করে গোবর গণেশ নন্দর মুখে এক দলা কাঁদা ছুড়ে মারে। আর মনে হয়, ভগবানকে হাতের কাছে পেলে ওর চুলের ঝুটি ধরে ঝাঁকিয়ে ঝাঁকিয়ে জিজ্ঞেস করত—তোমার এক চোখ কেন ভগবান? গরীবকে কি সব দিক দিয়ে ঝাঁটা মারবে বলেই ধরাতে পাঠিয়েছ? তাহলে প্রাণ-মন দিলে কেন, সাধ-আহ্লাদ দিলে কেন? তুমি না জগতের পালন কর্তা? এই কি তোমার প্রতিপালনের ছিরি? থুঃ! থুঃ তোমার মুখে এটো কাঁটা ডাঁটা ছুড়ে মারতে ইচ্ছা করে।

—সুন্দরী চাল কয়টা দিবিরে।

—আজও বুঝি শশীদা কিছু করতে পারেনি?

—না। সুন্দরী, এবার মরে যাবরে। বাচ্চাগুলোও মরে যাবে। হায়রে কেন যে ওগুলো এসেছিল? এই পোড়ার শরীরে সখ না থাকলে তো ওরা আর আসতে পারত না।—চারুর শুকনো ভাঙ্গা গালের উপর দিয়ে টস্ টস্ করে জলের ধারা নামে।

সুন্দরী চাল আর ডাল কয়টা দিয়ে চারুকে বিদায় দিতেই মনে হয়—না এটা ভাল মানুষের জায়গা নয়। চারুদি কি আর ভাল থাকতে পারত না। মালবাবুর বাড়ীতে কাজ নিলেই তো ওর ভাঁড়ার ভরা থাকত? চারুদি ভাল বলেই তো ওর এত দুঃখ কষ্ট? এখানে গুণ্ডামী করলেই যেন তোফা থাকা যায়। ঠকাও, ভাল হবে, বড় লোক হয়ে যাবে, সমাজের একজন হয়ে উঠবে?

চৌধুরী বাবুর মত একজন। দুরছাই! ভাল মন্দ মেনে মেনে নিজেকেই শুধু কষ্ট দিয়ে এসেছে এতদিন সুন্দরী? বিন্দী হরিমতী ওই বিলাসপুরী; ছন্নছাড়া দক্ষিণ ভারতের মেয়ে বউগুলো কি আর খারাপ আছে। বেশতো হেসে খেলে বেড়াচ্ছে। যেন বুকের উপর ভার বলে কিছুই নেই তাদের, যেন পেষনে পেষনে বুকটাই উড়ে গেছে কবে একদিন। সুন্দরীর মত এত ভাবনা চিন্তার ভাল-মন্দরও ধার ধারে না ওরা। দেহগুলো যেন সরাইখানার মতই আশ্রয় দেবার জন্যে তৈরী হয়ে আছে। সুন্দরীই বা ভাল হতে যাবে কেন? হয়ে লাভ কি?

সুন্দরী শুধু মনে মনে ভাবে, কাজে কিন্তু তার কিছুই করে উঠতে পারে না। মনের কোন অতল থেকে যেন একটা কিছুর তর্জনী উদ্যত হয়ে থেকে তাকে শাসন করে। মনে হয় সব আর মিথ্যা হয় কি করে? এই যে উপেনদা, এটা-সেটা এনে দিচ্ছে, খোঁড়া পায়েও কত সাহায্য করছে, চারুদি এসে এসে কত উপকার করছে, শশীদা যেতে আসতে খোঁজ নিচ্ছে, সুখন রামজী একদিন কয়েকটা দাগ ধরা কমলালেবু এনে দিলে, এই সব কি আর কিছু লাভের আশায় করছে ওরা। তবে?

সুন্দরী যেন নিজের মনের ভেতর খানিকটা শান্তি পায়।

দিন-চার পাঁচ পর একদিন রাতে হঠাৎ সনাতনের বুকের গর-গরানিটা বেড়ে উঠে। শ্বাস-প্রশ্বাস যেন আট্‌কে আট্‌কে যেতে থাকে। চোখ দুটি যেন যন্ত্রনায় ঠিক্‌রে ঠিক্‌রে বেরিয়ে আসতে চাইলো। সুন্দরী ভয় পেয়ে কেঁদে ওঠে।

—বাবা! বাবাগো; কি হল তোমার?

সনাতনের ঘাড়টা বেঁকে বেঁকে উঠতে থাকে এক একবার।

—বাবা, এই তো বুকে হাত বুলিয়ে দিচ্ছি। বাবাগো, কথা বলো। বাবা! ও বাবা। ভগবান, আমি কি করি এখন? বাবগো, আমার যে কেউ নেই গো।

সনাতন জিব্‌টা বার করে নিচের ঠোট্‌টা বুঝি চাটতে চাইছিল। সুন্দরী উঠে একটু জল এনে দেয় মুখে, মুখের কষ বেয়ে গড়িয়ে যায় খানিকটা। সনাতন যেন কিছু বলতে চাইছে সুন্দরীকে, হাত দিয়ে যেন ঘরের কোনের দিকে কিছু একটা দেখাতে চাইছে।

—বাবা গো, এই তো আমি ?

সনাতন বুঝি সুন্দরীর কথা শুনেই ক্রমশঃ ঝিমিয়ে পড়া চোখে সুন্দরীর দিকে একবার চায়। তারপরই সনাতনের শরীরটা ক্রমশঃ শিথিল হয়ে আসে। মৃত্যু! মৃত্যু এই মাঠে অনেক দেখেছে সুন্দরী। সেই মৃত্যুই যেন আবার তার সর্বনাশ নিয়ে আসছে।

সুন্দরী ডু'করে কেঁদে ওঠে—বাবা গো, তুমি আমাকে কোথায় ফেলে গেলে গো। বাবা! বাবাগো, কথা বলো। আমার যে কেউ নেই গো বাবা আ···আ···

সুন্দরীর কান্না শুনে এ-ডেরা-সে-ডেরা থেকে অনেকেই এসে ভীড় করে দাঁড়ায় সনাতনের ডেরার সামনে। কানাই ভুলে অটলও আসে। কানাই অন্ধকারে দাঁড়িয়ে মনে মনে ফিক্ ফিক্ করে হাসে—এবার যাবি কোথায় ? এবার দেখব, কোন বাপ্‌ তোকে রক্ষা করে। শালী কাকার ঘরেই এসে সোয়াগ করবি।

অটল ভুলেকে একটা ঠেলা মেরে বলে—ছাখ, ওই বনমানুষের বাচ্চাটা এই দিনেও বিড় বিড় করে কি মতলব ভাজ্‌ছে।

ভুলে বলে—কানাই-এর অবস্থায় পড়লে তুই শালাও এমন করতি। তা চল, বুড়োটা বেঁচে থাকতে অনেক মোড়লী করেছে, এবার শশ্মানে নিয়ে গিয়ে বেশ কতকটা বাঁশ পেটা করে ছাড়ি।

অটল হেঁড়ে গলায় হেসে বলে—হারমাদের মস্করার রকমটা দেখ একবার ?

নিজের উপর রাগ হয় নন্দর ; রাগ হয় উপেনের উপরও। ঘৃণা করে তাদের, যারা দেশকে কেটে দু'ভাগ করেছিল। কেন কেটেছিল

কে জানে? কি লাভ হল তাতে? কাদের লাভ হল? নন্দ অত বোঝে না, শুধু দেখতে পায় সেই আশ্রয়চ্যুত, তাড়িত নিঃসম্বল মানুষরা অসংখ্য আপন জনের দুঃসহ মৃত্যুর সাক্ষী হয়ে আর কলংকিত রক্ত বন্যার প্রেতায়িত ছায়াছবি মনের ভেতরে গেঁথে নিয়ে দেশময় খড়কুটোর মত হাহাকার করে বেড়াচ্ছে। হায় রে। মানুষে মানুষে কি দুর্মতি!

এখনও মনে পড়ে আর বুক ভিজে ওঠে। আহা। মাঠে মাঠে কচি কচি শিশু ধান গাছের বাতাসের দোলায় কত বিচিত্র ভঙ্গিতে সর সরিয়ে ওঠা, দূর থেকে দূরে, আরও দূরে দিগন্তের সবুজ বনানী যেখানে ঘনকৃষ্ণ রেখাঞ্চল বিছিয়ে স্বপ্ন চোখ মেলে থাকে, কেবল সোনালী ধান আর ধান। সোনার ছবি। সুখের ছবি। হায়! আলে আলে গান গেয়ে ফেরা, যাত্রা, কথকতা নয়ত কপাটি নিয়ে এ-গায়ে সে-গায়ে কি উত্তেজনার দিন, সব গেল কোথায়? সেই নিরুপদ্রব শান্তির দিন? আর কি ফিরে আসবে!

নন্দ শুনতে পায় মানুষ জন বলাবলি করে এখন নাকি মন্দার দিন। দেশ হাহাকারে ভরে যাবে। বাকী আছে কোথায়? দুঃস্থ আর ভিখারীর সংখ্যা যে লাফ দিয়ে দিয়ে বাড়ছে। রুজি রোজগার সবই তো ভাগ হয়ে যাচ্ছে সকলের ভেতর? আর লোকেরই বা দোষ কি? নিজের সামর্থ না থাকলে কে আর নিজের নাক কাটতে যাবে। বড়লোকদের দয়া-মায়ার প্রবৃত্তি তো সজাগ নয়? কখনো কখনো যা করে ঝোকের বশে করে' লোক দেখানো করে। ভাগ্যকে ছাড়া আর দোষ দেবে কাকে নন্দ ওরা। এই দুর্ভোগ নিয়ে বেঁচে থাকাটাই তো পাপ। তাই বুঝি পাপ আর নোংড়ামী কখনো এদের হাত ছেড়ে দেয় না?

তবু নন্দ বোঝে, নিজের মন দিয়েই বোঝে, ভাল ভাবে কে না আর বাঁচতে চায়! নন্দও বেঁচেছিল। তবু আরও একটু ভাল ভাবে সাধ-আহ্লাদের ভেতর বাঁচতেই চাইছে না কি সে? কিন্তু

বাঁচবে সে তার সম্বল কোথায়, সহায় কোথায়? ভগবান বিরুদ্ধে; ভদ্র মানুষের সমাজ বিপক্ষে, নিজদের সমাজেও মনুষত্বে নেই। বাঁচবে কোন মন্ত্র বলে। রাগ হয় নন্দর। উপেন তাকে এখানে নিয়ে না এলে এই সাধ আহ্লাদের যন্ত্রনায় এমন ক্ষত-বিক্ষত হত নাকি সে? বেশ তো ছিল। কোন শিকড় ছিল না, এশহরে সেশহরে নোঙ্গর ফেলে ফেলে চলেছিল, পাখীর মত উড়ে উড়ে বেড়াচ্ছিল, খুটে খুটে খাচ্ছিল। সুখের লোভ ছিল না, দুঃখ বোধও ছিল না কিছু। শুধু দায় ছিল দুটি খেতে পরতে পারার। বেশ তো ছিল?

—গায়েন, তুমি আজ কাল অত কি ভাব বল দেখি?

—ভাবছি রুজি-রোজগার নেই, দিন চলবে কি করে।

উপেন উৎসাহ দিয়ে বলে—চলে যাবে গায়েন, চলে যাবে দেখো। কোথায় আর ঘুরে ঘুরে বেড়াবে। এখানেই দু'ভায়ে গাদাগাদি করে থেকে যাই না; কি বল?

হঠাৎ কি মনে হতেই নন্দ বলে— আচ্ছা উপেনদা, তুমি আমাকে কোথাও যেতে দিতে চাওনা কেন বল তো? আমি তো তোমার কোন কাজই করে দিতে পারি না। তোমাকেই রান্না করে খাওয়াতে হয়!

—হঃ হঃ গায়েন, খুব কাজ একটা। আমি ঢেম্‌না তো চাটের উপর বসে বসেই দিন কাটাই। একটু না খাটলে গতর ভাল থাকবে কেন? তা তুমি কি যে সে লোক? তোমার গান শুনলে চোখে জল আসে, মনটা কেমন করে। বলতে কি, তোমার গান শুনেই তো আমি শালা একেবারে ছুঁচো হয়ে গেলাম।

উপেনের কথার ধরন দেখে নন্দ হাসে।

উপেনও হাসে, বলে—একবারে তো বেড়াল কুকুর হয়ে যাইনি? মানুষের তো একটা সঙ্গী চাই। তোমার মত সঙ্গী আর কোথায় পাব?

নন্দর মনে আবার কিল বিল করে ওঠে কথাটা—সঙ্গী সাথী

তো সেও চায়। শুধু উপেনের সঙ্গ নিয়েই সে তৃপ্ত থাকতে পারছে কোথায়? আরও একটা মানুষের সঙ্গ লাভের জন্য বুকের ভেতরটাতে একটা কাঁটা এমন খচ্ খচ্ করে বাজে কেন, রক্তের ভেতরে এমন ঘূর্ণীহাওয়ার ঝাপটই বা লাগে কেন? কে জানে, হয়ত যে মানুষের যতবেশী সঙ্গ পাবার সুবিধে থাকে; সে মানুষ ততই নূতন নূতন সঙ্গের জন্য ব্যস্ত হয়ে ওঠে। লোভ, লোভকে বাড়ায়, পাপ আরও পাপের দিকে টেনে নিয়ে যায়? মনের স্বভাব-চরিত্র কি এই নিয়মেই চলে?

তাই বুঝি একটা থোক রোজগারের লোভে কানাই মান্নার সেই লোভনীয় দিনটির জন্য অপেক্ষা করে থাকে নন্দ। আড়ালে আবডালে কানাইকে জিজ্ঞাসা-বাদ করে—আর কতদিন, এত দেরী হচ্ছে কেন?

—ব্যস্ত হচ্ছ কেন গায়েন। যেদিন যাবে সেদিনই পেট ভরে যাবে। এমন দু'চার বার করতে পারলেই তোমাকে পায় কে?

—বিপদ হবে না তো কিছু কানাইদা?

—আরে বিপদ আবার কি? আমরা আছি না? তবে খবরদার, কাউকে ফাঁস করবে না। উপেনদাকে বলেছ তো, সব গেল। আরে গায়েন, এখন বলবার দরকারটাই বা কি? কিছু কামিয়ে নাও না আগে। জানাজানি হলে সব শালা ভাগ বসাতে চাইবে তখন।

উপেনের কাছ থেকে ব্যাপারটা গোপন করে রাখতে নন্দর খারাপ লেগেছিল। কিন্তু উপায় কি, জানাজানি হয়ে গেলে যে সব বরবাদ হয়ে যাবে। নন্দর যে এখন খুবই দরকার কিছু টাকার? নইলে সুন্দরীকে যে কিছুই বলতে পারছে না সে? বলতে পারবে না সে, বলো দেখি, নাক-কুঁচানি কত রোজগার করি এখন। শোন, শোন ঠোঁট বাঁকানি, আমার রোজগারটা শুনে যাও। কিন্তু কথাটা বলতে পারবে কি নন্দ? এত বড় নির্লজ্জ হতে পারবে কি?

নন্দ ঠিক করে মনে মনে, হতেই হবে, নইলে আর পথ কোথায় ? ইদানীং সুন্দরী কানাই-এর সঙ্গে ঠারে ঠারে কথা বলতে আরম্ভ করেছে। মাষ্টারবাবুর বাড়ীতে রেল-কোম্পানীর একটা লোক বাগানের কাজ করে দিতে আসে, তার সঙ্গে ও হেসে হেসে কথা বলে সুন্দরী। নন্দ কোথায় থাকে, কেমন করে দেখে কেউ জানে না কিন্তু সে সবই দেখতে পায় আর একটা হিংসুটে যন্ত্রনায় জ্বলতে পুঁড়তে থাকে। সুন্দরী যে আজ কাল আর তাকে গ্রাহ্যই করতে চাইছে না ?

নন্দর মন-মেজাজ ক্রমশই তিরিক্ষে হয়ে উঠতে থাকে।

—এই যে শশীদা, এমন মন মরা হয়ে বসে আছ কেন ?

নদী থেকে ফিরবার পথে শশীর ডেরার সামনেই সেদিন দেখা হয়ে যায়। শশী তখন বসে বসে বিড়ি টানছিল।

শশী বলে—গায়েন ভাই, মনের দোষ কি, সারাটা দিন গেল, পেটে দেবার মত কিছুই জুটল না। এবার বোধ হয় বাচ্চাগুলো না খেতে পেয়েই মরে যাবে।

—তোমার রোজগার তো ভালই ছিল ?

—ছিল তো কিন্তু বাজারটা যে ভীড়মী খেয়ে গেল। তা কি আমারই শুধু গায়েন ; সকলেরই ? তোমার ও কি আর আগের রোজগার আছে ? গায়ে গতরে ও শক্তি নেই যে আর কিছু করি।

—সনাতন খুঁড়ো চলে গেল, বেঁচেই গেল কি বল শশীদা।

—খুঁড়ো তো বেঁচে গেল কিন্তু সোমত্ত মেয়েটার গতি কে করে ? মেয়েটা বড ভাল ছিল গায়েন। ভদ্রলোকের মেয়ের মত। এখন তো চারিদিক থেকে কেবল ফুসলাতে চাইছে এ সে। গাঁ' সুবাদে দাদা ডাকে কিন্তু কি করতে পারি বলো দেখি ভাই গায়েন। কে কবে লোপাট করে দেবে, কেমন করে ভেসে যাবে কি করে বুঝব। তাই তো চারুকে বলেছি, রাত্তিরগুলো তুই ওর সঙ্গেই থাকিস। মেয়েটাও যেন বাঁচল।

শশী টিনের কৌটো খুলে দুটো বিড়ি বার করে একটা নন্দকে দেয়। বলে—নাও, ধরাও একটা গায়েন।

নন্দ বিড়ি ধরিয়ে দু' টান দিলে শশী বলে—আচ্ছা গায়েন, তুমি তো একটা হিল্লে করতে পার মেয়েটার?

আমি?—নন্দ ভেতরে ভেতরে চমকে যায়; রোমাঞ্চিত হয়ে ওঠে।

—তুমি বিয়ে করে ফেল মেয়েটাকে। তোমার সঙ্গেই তো মানাবে ভাল। বেশ কচি কচি বয়স তোমাদের? তাছাড়া তুমি তো আর আমাদের মত হাড়-হাভাতে নও। সুন্দরী খুব খুশী হবে।

নন্দ মনে মনে খুসী হলেও মুখে চিন্তার ভান করে বলে—রোজগারপাতি নেই শশীদা। বউ পোষা তো সোজা কথা নয়? সুন্দরী আবার ভদ্রলোকের মত হয়ে গেছে।—বলতে বলতে বেশ একটা সুখ সুখ ভাব নিয়েই আস্তানায় ফিরে আসে। নন্দ যেন ধরা পড়তে পড়তে কোন রকম ভাবে প্রাণ নিয়ে বেঁচে আসতে পেরেছে। সুখের ভাবনাতেও এত শ্বাস কষ্ট কেন নন্দ বুঝতে পারে না।

উপেন তখন উনুন থেকে ভাত নামিয়ে ডাল বসিয়েছে। নন্দকে দেখে বলে—বুঝলে গায়েন, কানাইকে আজ একটু কড়কে দিলাম। বললাম মেয়েটার মা বাপ নেই; কিছু খারাপ করেছিস শুনি তো ভাল হবে না। তা শালার বেটার কি নাক ফোঁস ফোসানী।

—কানাই তোমাকে এত ভয় করে কেন উপেনদা?

—কারণ না থাকলে কি আর করে? তা বজ্জাৎটা বলে কি শোন গায়েন? বললে—সুন্দরীকে বুঝি তোমার গায়েনের জন্য মানত করে রেখেছ। মনে মনে তোমার কলা খাওয়াই সার হবে উপীনদা। বলে বেটাচ্ছেলে ফঁক ফঁক করে হাসতে লাগল।

উপেন এরপর কি বলবে সে কথা ভেবে খানিকটা অস্বস্তি খানিকটা সুখের আনন্দে চুপচাপ বসে থাকে নন্দ।

—কানাইটা বলল বলেই তো কথাটা আমার মাথায় ঢুকল

গায়েন। সন্ধ্যাবেলা থেকে ভাবছি, খারাপ কি? বেশ হয়। সুন্দরীতো তোমাকে পছন্দও করে খুব। আমাদের দু' জনের রোজগারে ঠিক চলে যাবে। তোমাদের ছেলেপুলে হলে আমি তাদের জেঠা হব; তাদের সঙ্গে বসে বসে খেলব, তাদের দেখাশোনা করব। গায়েন ভাল হবে না?

উপেনের কথা শুনে কি তার গলার স্বরে, কে জানে কেন নন্দর দু' চোখ ভরে গেল জলে। বলে—উপেনদা তুমি বলছ ভাল হবে?

—হ্যাঁ গায়েন, ভাল হবে। আমি তো থাকবই সঙ্গে।

—কিন্তু সুন্দরী রাজী হবে না বোধ হয় উপেনদা। এখন তো দেখি অনেকের সঙ্গেই তার ভাব। আমাকে দেখলে ঠোট বাঁকিয়ে বাঁকিয়ে হাসে।

—দাঁড়াও, আমি সুন্দরীকে জিজ্ঞেস করব। মেয়েটা বড় ভাল ছিল গায়েন। যেন গোবরে পদ্মফুল। কি সুবাস।

নন্দ কি আর জানে না সুবাস কাকে বলে, সুর কি জিনিষ। সুবাস আর সুরই তো তাকে এখানকার এই বিশ্রী অমানুষিক পরিবেশটাতে বেঁধে ফেলেছে। লোভ বাড়িয়ে তুলেছে, একটা শুঁয়োরের মত গোঁ ধরিয়েছে, পাপের পথে এগিয়ে দিয়েছে লোভাতুর মনটাকে, রুজি-রোজগারের আশায়। নন্দ ভাবে তার সময়টা ভালই চলেছে এখন। সুন্দরীর প্রতি লোভের কথাটা আর তাকে মুখ ফুটে বলতে হয়নি। কানাই মান্নাও খবর দিয়েছে পরশু রাত্রিতে কাজে বেরুতে হবে। পৌঁছে দিলেই শ' পাঁচ টাকা। সত্যি, টাকা চারিপাশে ছড়িয়ে আছে, ধরতে পারলেই হল। পাঁচ শ' টাকা নিয়ে সুন্দরীর সামনে দাঁড়ালে সুন্দরীর মুখে কি আর হাসি ফুটে উঠবে না; চোখ দুটি জ্বল জ্বলে হয়ে উঠবে না?

খানিকটা রাতে প্রাকৃতিক কারণে নদীর ধারে যাবার প্রয়োজন হতেই ঝাঁপ্ খুলে বেরোয় নন্দ। উপেন তখনো জেগেছিল, বলে—কোথায় যাও গায়েন?

—পেটটা বড় গড়বড় করছে উপেনদা। নদীর ধার থেকে আসি।

. উপেন আর কিছু না বলে পাশ ফিরে শোয়। নন্দ ঝাপটা বন্ধ করে ঘুপচি মাঠের অন্ধকার দিয়ে নদীর ধারের ঝোপজঙ্গলের দিকে এগিয়ে যায়। রাত হয়েছে একটু, মাঠটা নিঝুম হয়ে শুয়ে আছে। সুন্দরীর ঘরের দিকে কেন জানি একবার চোখ চলে যায় নন্দর। কোন আলো নেই, সুন্দরী ঘুমিয়ে পড়েছে, তার ফষ্টিনষ্টি নিয়ে সুখেই আছে সে। তার চোখে আর ঘুম আসবে না কেন? নন্দর মনের ভিতর একটা রাগ চিরচির করে ওঠে। সঙ্গে সঙ্গে আগামী পরশু রাতের কথাটা মনে পড়তেই আকশি দিয়ে আকাশ থেকে একটা সান্ত্বনাকে যেন টেনে নামিয়ে এনে খুসী হয়। এক মুঠো টাকার সুখে তার মনের ভিতরটা গদ্‌গদে হয়ে ওঠে।

নদীর ধার থেকে নন্দ তখন ফিরে আসছিল আস্তানার দিকে। ঝোপে-ঝাড়ে অন্ধকার ঘুটঘুট করছে। নন্দ তারা-জ্বলা অনেক খোলা আকাশ দেখতে দেখতে এগোচ্ছিল।

মাঠের দিক থেকে আর একটা মানুষ এই সময় এগিয়ে আসছিল। হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে প্রশ্ন করে—কেও তুমি?

নন্দও চমকে উঠেছিল। কিন্তু মানুষটার গলা শুনেই বুঝতে পারে সে কে। নন্দ বলে—আমি গায়েন।

বিন্দী সাপিনীর মত হিস হিস করে হেসে ওঠে। বলে—ওঃ বাবা গায়েন, তুমিও তাহলে রাতের শকুনী হয়েছ। ডুবে ডুবে জল খাচ্ছ।

—বাজে বকো না। আমি নদীর ধারে গিয়েছিলাম।

—ধরা পড়লে সকলেই বলে নদীর ধারে গিয়েছিলাম। তা গায়েন, নাগরীটা কে। সুন্দরীকে তো বলতে হবে তোমার গুণের কথা।

বিন্দী খুব কাছেই এসে দাঁড়িয়েছিল নন্দর। বিরক্তি আর

রাগে নন্দর ইচ্ছে করছিল ঠাস করে একটা চড় কষিয়ে দেয় ছিনালীর গালে। কিন্তু পাশ কাটিয়ে চলে আসবার আগেই বিন্দীর কি হল কে জানে, হঠাৎ ভয় পেয়ে অস্ফুট চিৎকারের সঙ্গে লাফ দিয়ে সরে এসে নন্দকে দু'হাতে জাপটে জড়িয়ে ধরে। তার পায়ের উপর দিয়ে শীতল একটা কিছু চলে গিয়েছিল যেন।

—কি হল? ছাড়ো ছাড়ো। নন্দ বিব্রত বোধ করতে থাকে।

—একটা কি যেন পায়ের উপর দিয়ে—

কিন্তু বিন্দীর ভয় এত সহজে যাবার নয়, তার ভয় যেন আরো বেড়ে যায়। নন্দ বুঝতে পারছে বিন্দির উদলা শরীরের থক্‌থকে মাংসল স্পর্শটা অস্বস্তিকর রোমাঞ্চেও কেমন ঝিলঝিলিয়ে তুলছে তাকে। গভীর আতংকে মানুষ যেমন করে তেমনি করে বিন্দি অস্থির ব্যস্ততায় আর চেপে চেপে নিজেকে নন্দর শরীরের ভিতর সেঁধিয়ে দিতে চাইছে। বদমাইশি নাকি?

নন্দ রাগত কণ্ঠে বলে—ছাড়ো বলছি। ভয় না ঘেচু। তোমার বদমতলবী।

—গায়েন তুমি ভীষণ বোকা।

—বোকা আছি তো তোমার তাতে কি? নন্দ তাকে ছাড়াবার চেষ্টা করে।

—ছাড়ব না। তোমাকে আজ ছাড়ব না আমি। বলতে বলতে বিন্দি যেন পিশাচীর মত রক্ত মুখী আর ঝোড়ো হাওয়ার মত আলু-থালু হয়ে ওঠে। নন্দর মত জোয়ান মরদকেও সে পথের পাশে ঠেলে ফেলে দিয়ে নারকীয় হয়ে উঠবার চেষ্টা করতে থাকে।

নন্দ বিমূঢ় হয়ে গিয়েছিল ছিনালী বিন্দীর উদগ্র কামনার আতিশয্য দেখে। একটু ফাঁক পেতেই এক ঝটকায় তাকে সরিয়ে দিয়ে উঠে দাঁড়ায়। বলে—বজ্জাতি।

বিন্দী ফোঁস করে ওঠে—তুই মরবি। তোর শনি ঘুরছেরে।

নন্দ হন হন করে চলতে আরম্ভ করে আস্তানার দিকে।

বিন্দী বিড়বিড় করে—কেবলরাম। বেটা ধর্মপুত্তুর। তুই মরবি, তুই জবাই হয়ে যাবি এবার। তোকে তো বাঁচাতেই এসেছিলাম। তা তুই ধোয়া তুলসী পাতা থাকবি তো থাক। বেটা সতী থাকবে। এবার তোর গোমর কোথায় থাকে দেখব ?

সেদিন শুয়ে শুয়ে অনেক আকাশ পাতাল ভাবনায় অস্থির ভাবে রাত কাটে নন্দর। শরীরের ভিতর আগেকার ঘিনঘিনে অনুভবটা যেন এখন গন্‌গনে হয়ে উঠে জ্বালা পোড়া করতে থাকে। একটা ক্ষোভ আর আক্রোশ এবং ভিতরের একটা অবদমিত লোভ কেবলই বোকা বোকা বলে চিৎকার করে বিদ্রূপ করছিল তাকে। তার শরীরের তাপযন্ত্রে একটা লু বারবারই এসে এসে তার স্বাক্ষর রাখছিল। নন্দকে এত জীবন্ত আর কখনো মনে হয়নি তার।

সনাতন যতদিন বেঁচে ছিল, একটা গাছের নীচে একটা নিশ্চিন্ত আশ্রয়ে ছিল সত্যি। কিন্তু বিধি নিষেধ ও কি কম ছিল ? ভয়ে ভয়ে না থাকতে হলেও কোন স্বাধীনতাই যেন ছিল না। পোষা একটা হরিণের মতই দিন কাটিয়েছে। এখন সুন্দরীর কোন আশ্রয় নেই, বিধি নিষেধ বলতেও কিছু নেই। সম্পূর্ণ স্বাধীন। সুন্দরী এক একদিন ভাবে, এখন সে যা খুশী তার তাই করতে পারে ; যেখানে খুসী চলে যেতে পারে। কতগুলো কুত্তা তো তার গায়ের মাংস চেখে চেখে খাবার জন্য লুলোপ চোখে চেয়ে বসেই আছে ? তু করলেই আস্তাকুঁড়ের বেটারা এসে হুমড়ী খেয়ে পড়বে। মাঝে মাঝে সুন্দরীর দেহের ভেতরের লোভটা যেন এখন আরও সজাগ আর দুঃসহ হয়ে ওঠে। মনে হয় একটা কিছু করে—কিছু একটা করে ফেলতে মনের ভেতর ও আছারি-পিছারি চলে।

কিন্তু একটু সময় পরই ভদ্রলোকের মত একটা সুস্থ মন তাকে চুলের মুঠি ধরে শাসায়। সুন্দরীর তখন মনে হয়, একবার লোভের ফাঁদে পা দিলে লোভ যে তখন তার দেঁতো হাসি হেসে কেবলই হাত ধরে টানাটানি করবে ? তখন আর সুখী হবে কি করে ? সুন্দরী

যে সুখী হতে চায়? অসুস্থ আর নোংড়ামীর ভেতর থেকে থেকে একটা স্বাভাবিক সুস্থ জীবনের জন্য যে সুন্দরীর আকণ্ঠ পিপাসা? মাষ্টারদা আর বৌদিদির মত? তার জন্যই তো নিজেকে তৈরী করল, এতকাল নিজেকে ধরে বেঁধে রাখল? খালি আশায় আশায়, শুধু পাবে পাবে ভেবে?

আর ভগবান তো মুখ তুলেও চেয়ে ছিলেন? কোথা থেকে নন্দ গায়েনকে ধরে এনেছিল উপেনদা? যেন কুচকুচে কালো পাথরে কুঁদে কুঁদে তৈরী করা একটা কেষ্ট ঠাকুরের মূর্ত্তির মত? অথচ কি নরম নরম সেই মূর্তির চেহারা-ছবি? মায়া হয়, সান্ত্বনা দিতে ইচ্ছা করে, আদর করতে সাধ যায় মনে। কি সুন্দর তার গলার গান। সুরে তালে দরাজ কণ্ঠে কি ভালই না গায় নন্দ গায়েন? শুনে সুন্দরীর বুকের ভেতরে প্রাণটা যে সেদিন থেকেই ধক্‌ধক্ করে উঠেছে তা কি আর জানেনা সে? শরীরের সমস্ত রক্তই তো এরপর থেকে জল করে দিতে লাগল নন্দ গায়েন।

কিন্তু ওর গায়ে কি রক্ত আছে? রক্ত থাকলে কি আর সাড়া দিত না নন্দ গায়েন। সুন্দরী না হয় হুল ফোটানো কথা বলে কিন্তু বিন্দী, হরিমতী, বিলাসপুরী, তেলেগু মেয়েগুলো কি দোষ করল? ওরা তো নদীর পারে ঝোপে, ঝাড়ে আট-আনা দশ আনার শয্যা পেতেই বসে আছে? একটা ভোৎকা নন্দ গায়েন, নয়ত কাপুরুষ, নয়ত ওর শরীরের রক্তে ঝাল নেই, লাল নেই।

চারু সেদিন বলে—হ্যাঁরে সুন্দরী, রেলের ওই লোকটা তো শক্ত সমর্থ; তোরও বেশ ন্যাওটা হয়ে পড়েছে। ওর সঙ্গে ঘর বাধ না? তুই যেমন ঢেমনীর মত ঘুরে বেড়াচ্ছিস্ দেখে শুনে ভয় করে আমার।

সুন্দরী খিল খিল করে হাসে, বলে—ওগো চারুদি, পুরুষগুলো কি বোকা গো? একটু হেসে কথা বললেই ভাবে ওর সঙ্গে বুঝি পিরীতে পড়ে গেলাম। গতরের কাছে দাঁড়াতে দিলে ভাবে গতরটা

বুঝি তার। কি বোকা গো চারুদি। সেদিন তো নদীর পারে দিলাম একটার মুখে লাথি কষে। সুন্দরী দাসীকে চেনেনি তো?

—কাকে রে?

—ওই দেশ থেকে আসা বিশ্বেশ্বরের ছেলেটাকে। শূয়োরটা আমাকে দশ টাকার নোট দেখায়।

—কিন্তু তুই এমন করে কয়দিন বাঁচবি বলতো! না হয় মাষ্টার বাবুর শ্বাশুড়ীর কাছেই চলে যা। সুখে থাকবি, শান্তিতে থাকবি। তারপর দেখে শুনে একটা কিছু করিস।

সুন্দরীর গলার স্বর কেমন ম্লান হয়ে আসে, বলে—আর কয়টা দিন দেখি চারুদি। গরীবকে ভগবান কিছু দেয় না গো চারুদি, কোন সাধ-আহ্লাদই পূরণ করে না গো?—বলতে বলতে কি একটা কষ্টে তার চোখ ভরে গেল জলে।

চারু বলে—গায়েনকে তো তোর শশীদা বলেছিল। সে বললে রোজগার পতি নেই এখন। তাছাড়া সুন্দরী ভদ্দরলোক হয়ে গেছে।

—তার মুণ্ড হয়েছে! গোবর গণেশ ভোংকা কোথাকার?

—এত ক্ষেপছিস কেন তুই?

—ক্ষেপব না? এত ভাল গায়, কিন্তু ঘটে যদি এক ফোঁটা বুদ্ধি থাকত? এমন থক্‌থকে কাঁদার মাথাও কারো হয়?

এর পর সুন্দরী সুযোগ পেলেই নন্দকে দেখিয়ে দেখিয়ে কানাই অটল, ভুলে, সেই রেলের লোকটা, তাছাড়া এর তার সঙ্গেও লেপটে লেপটে কথা বলে, হাসে। সুন্দরী বুঝতে পারে নন্দ গায়েনের চোখ কড় কড় করে, মনে মনে গালি-গালাজ করে। সুন্দরী ভাবে, গোবর গণেশ, আর কিছু মুরোদ নেই তোমার। কেবল দূরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পিরীত পিরীত ভাব করা কেন? এগিয়ে আসতে পার না? পিরীতের সখ আছে কিন্তু সাহস নেই কেন সে কথা বলবার? কখনো কখনো আবার সমবেদনার সঙ্গে ভাবে—আহা! কি মুখ-

চোরা ভাল মানুষ গায়েন? কেমন মায়া হয়। আরও যেন কত কি ইচ্ছে করে সে সময় সুন্দরীর।

এখন তো সারাটা দিনই মাস্টারবাবুর বাড়িতে কেটে যায় সুন্দরীর। কি হবে আর ডেরায় ফিরে? যতদিন সনাতন ছিল ততদিন জীবনটা ছিল অন্যরকম। এখন মাঠটার জন্য তার আর তেমন মায়া নেই। নন্দ না থাকলে ওটা মরুভূমির মতই মনে হত সুন্দরীর। তাকে সরিয়ে নিয়ে একেবারে ভুলে যেতে পারত। কিন্তু উপায় কি? মাস্টারবাবুর বাড়িতে স্থান নেই শোবার। ডেরায় ফিরে আসতে হয় সেজন্যে তাকে।

মাস্টারবাবুর স্ত্রী সেদিন বললেন—কিরে সুন্দরী, কি ঠিক করলি?

সুন্দরী একটু ভেবে বলে, আমি চলে গেলে আপনাদের অসুবিধা হবে না বৌদিদি?

—হবে না আবার? তুই কি সোজা কাজটাই করিস?

—তবে আমাকে পাঠিয়ে দিতে চান কেন?

বৌদিদি হেসে বলেন—আমার এখানে তোকে থাকতে দি তেমন জায়গা যে নেই তুই তো দেখছিস। আর মাঠে তুই একা একা থাকবি কেমন করে? তুই যে সর্ব্বনাশী, সারা শরীরে তুই যে বিপদকে ডেকে বেড়াচ্ছিস; পুরুষ মানুষের লোভকে যে তুই খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে তুলছিস। তোর ভাল চাই—বলেই তো তোকে পাঠাতে চাই সুন্দরী। তোর মাষ্টারদা বলেন······

—কি বলেন বৌদিদি—সুন্দরী উৎসুক হয়ে ওঠে।

বৌদিদি হাসতে হাসতে বলেন—তোর মাষ্টারদা মানুষটাতো এক ধরণের পাগলই জানিস্। বলে—একটা নোংরা বস্তির মেয়ে যদি ভাল হয়, ভালভাবে বেঁচে থাকতে পারে পৃথিবীতে, তবে তাতে পৃথিবীরই নাকি মহা লাভ।

সুন্দরীর বুক ভিজে যায়; চোখ ছল ছল করে ওঠে। বলে—

বৌদিদি……কিন্তু কথাটা বলতে গিয়েও সুন্দরী একটু থেমে যায়। সংকোচে লজ্জায় রক্ত লাল হয়ে ওঠে তার মুখ। সুন্দরী মুখ নত করে চুপ করে থাকে।

—কিরে, চুপ কেন সুন্দরী? কি বলবি বল?

সুন্দরী ফস্ করে বলে—আমি কি ওখানে একা থাকব নাকি? আমি বুঝি আপনার মত……

—ওঃ তাই বল্। বৌদিদি হাসতে থাকেন আর নিজের শরীরের তলপেটের অংশটুকুকে সস্নেহ দৃষ্টিতে একবার দেখে নিয়ে আঁচল দিয়ে সযত্নে ঢাকা দেন।

বৌদিদি বলেন—হবি! হবি! যাতে মা হয়ে ছেলে-পুলে নিয়ে শান্তিতে থাকতে পারিস তাই তো চাইছি আমি? মাকে আমি তেমন করেই চিঠি লিখে দেব। তাছাড়া মাস দুয়েক পর তো আমিও চলে যাবরে সেখানে? তোর আর ভয়ের কি আছে?

সেই, সেদিন থেকেই কেন জানি এলোমেলো কতগুলো ভাবনায় আচ্ছন্ন হয়ে থাকে সুন্দরী। তবে চলে যেতে হবে বলেই যেন মনের ভেতরটাও তৈরী হয়ে উঠছে তার। আর কি? আর বৃথা আশা করে কি লাভ! সুন্দরীর জন্য সকলে পাগল আর নন্দ গায়েনের সাড়্ হল না শরীরে মনে? কি ভীতু কাপুরুষ লোকটা?

সুন্দরী কি একটা অসহ্য রাগে ফোঁসে আর মনে মনে বলে, যাবার আগে যদি এক চিলতে সুযোগ পায় তবে ওকে আচ্ছা মজা দেখিয়ে যাবে সুন্দরী? ওকে নাস্তানাবুদ্ করে ছাড়বে। তখন দেখা যাবে ওর গায়ে রক্ত আছে কিনা। আর সেই রক্তে তস্ আছে কিনা?

খুব ভোরে ভোরে নদী থেকে স্নান সেরে আসছিল উপেন। সুন্দরীও যাচ্ছিল নদীর দিকে। বড় কৃষ্ণচূড়া আর সোঁদালী ফুলের গাছটার কাছে উপোনর সঙ্গে দেখা হয়ে যায় তার।

—তোকে তো আর দেখতে পাই নারে সুন্দরী?

— সারাদিনই তো কাজে থাকি উপেন দা ?

—তোর সঙ্গে একটা কথা আছে। বুঝলি খুব ভাল কথা। তা এখন……না, এখন থাক্, সন্ধ্যাবেলা ফিরে এসেই বলব না হয়। যা তুই তোর কাজে।

সুন্দরী চলতে চলতে ভাবে তার সঙ্গে কি কথা থাকতে পারে উপেনদার ? আর কথাটা নাকি খুবই ভাল কথা ? দূর ছাই, শুনে নিলেই তো হতো। ঝামেলা চুকে যেত ? মনের ভেতর এমন উৎকণ্ঠা নিয়ে চিন্তা ভাবনার এত ঝক্কি সইতে হত না ? সারাটা দিন এখন তো চোখ শুধু সেই সন্ধ্যার দিকেই চেয়ে থাকবে আর অস্বস্তি ভোগ করবে। আচ্ছা, উপেনদা কি নন্দ গায়েনের কথা কিছু বলবে ? আচ্ছা ; এমনও তো হতে পারে নন্দ সুন্দরীকে বিয়ে করতে চাইছে, এই কথাটাই বলবে উপেনদা ? আঃ সুন্দরী যেন এই কল্পনাটার ভেতর কি একটা তৃপ্তি পায়। আশ্চর্য্য একটা শান্তিতে দু'চোখ যেন বুজে যেতে চায় তার। গায়েন কি সুন্দর ? এখানে ওর মত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন কে আর আছে ? কি লাজুক শান্ত লোক সে ? সুন্দরী তার ভাবনার চেহারাটা লক্ষ্য করে অবাক হয়। এত ভালোবাসল কবে নন্দ গায়েনকে সে ? ইস্, সুন্দরী কি তাকে ছেড়ে চলে গিয়ে সেখানে খুসী হতে, সুখী হতে পারত ? সুন্দরীর প্রাণের ভেতরটা কেঁদে কেঁদে মিনতি করে—ভগবান আমাকে ঠকিও না। আমার একটা সাধ রাখ। আর কিছু চাই না, চাই না ভগবান।

মাষ্টার বাবুর বাড়ীতে আজ একটা ভোজের অনুষ্ঠান ছিল। সুন্দরী আবছা আবছা জানত যে, মাষ্টারদা নাকি, কি সব লিখে এখানে ওখানে বই পত্তর ছাপান। তারই একটা এবার পুরষ্কার পেয়েছে। বন্ধুদের নিয়ে তাই এই সুখোৎসব।

সারাদিন খেটে খেটে অবেলায় খেতে বসে কেমন যেন গা গুলিয়ে ওঠে সুন্দরীর।

— কিরে কি হল তোর ? এমন করছিস কেন ?

—বৌদিদি, আমার শরীরটা কেমন করছে। আমি ঘরে যাচ্ছি।

—তাই বরং গিয়ে খানিকটা বিশ্রাম নে? আমি সব রেখে দেব। সন্ধ্যাবেলা এসে খাবি।

সুন্দরী ডেরায় এসে শুয়ে পড়ে। শরীরে কি একটা কষ্টকর অস্বস্তি? সারাদিন খেটেছে এক নিঃশ্বাসে অথচ জলটিও মুখে তোলেনি সে। তুলবে কখন? ফুরসুৎই তো পায়নি সুন্দরী? সকলে সুন্দরীর কাজ কর্ম দেখে বাহবা দিয়েছে খুসী হয়ে প্রশংসা করেছে। আর নিজেও সে উৎফুল্ল হয়ে দু'টো হাতেই দশহাতের কাজ করেছে। কখন পিত্তি পড়ে গেছে, মাছ মাংসের গন্ধে গন্ধে স্নায়ু দুর্ব্বল হয়ে এসেছে বুঝতেই পারে নি সুন্দরী।

এক সময় চারু এসে তাকে ঠেলা দিয়ে তোলে, বলে—কিরে সুন্দরী, এই অবেলায় শুয়ে আছিস কেন?

—শরীরটা কেমন করছিল চারুদি।

—মুখ দেখে তো মনে হয় কিছু খাসনি। খাবি কখন?

—সন্ধ্যাবেলা গিয়ে খাব।

চারু বলে—এখন একটু ভাল বোধ করিস তো, যা, নদী থেকে ডুবিয়ে ডুবিয়ে স্নান টান করে আয়। দেখবি ভাল লাগবে। তারপর না হয় শরীরের গতিক দেখে খেতে যাস।

চারুর কথা শুনে সুন্দরীর সমস্ত প্রাণটাই যেন এবার বুঝতে পারে, ঘামে পরিশ্রমে অভুক্ত শরীরটা বালিহাঁসের মত ডুবিয়ে ডুবিয়ে স্নান করতেই চাইছে এখন। চাইছে যেন একটা শীতল আলিঙ্গন তাকে সমস্ত শরীর শুদ্ধ জড়িয়ে নিক, যে কোন রকমের একটা প্রসন্ন দাক্ষিণ্য তার দেহের ইন্দিতে-ছিন্দিতে স্বস্তির, তৃপ্তির নূতন স্বাদের আস্বাদ প্রবাহিত করে দিক। কিছু একটা হউক, নূতন কিছু হউক। ওই পুরানোকে নিয়ে পঁচে পঁচে আর কত দুর্গন্ধময় ক্লান্ত হবে?

তখন বেলা পড়ে এসেছে। রোদের রং গাঢ় হতে হতে কালচে

হয়ে আসছে। নদীর ধারের ঝোপে ঝাড়ে অন্ধকার রাত্রির পায়ের শব্দ ঝুপ্ ঝুপ্ করে নেমে আসছে। সমস্ত পশ্চিম আকাশটা যেন নিবিড় কোন অণুরাগের রক্তিম লাবণ্যে পৃথিবীর দিকে চেয়ে আছে।

সুন্দরী নদীতে নেমে হাতের কোষ ভরে দু' কোষ জল মাথার তালুতে চাপ্ড়ে চাপ্ড়ে দেয়। আকস্মাৎ এই সময় তার লক্ষ্য পড়ে কে একটা লোক নির্জন শশ্মানটার দিকে হেটে চলে যাচ্ছে নন্দ গায়েন না? এই সময় ওদিকে কেন যাচ্ছে গায়েন, অত দূরে যাবারই বা কি দরকার? সুন্দরী অবাক হয়, কেমন একটা সন্দেহ তার ভেতর ছুব্লে ওঠে। মনের ভেতরটা কে জানে কেন জ্বালা পোড়া করে ওঠে। আর কেন জানি ঠিক 'সেই সময়ে সেই অন্ধকারের আবেগটা ফুঁসে ওঠে ঠাশ করে। দাঁড়াও, ডুবে ডুবে জল খাওয়া তোমার বার করছি?'

সুন্দরী নদী থেকে উঠে আসে। লোক জনের দৃষ্টি এড়াবার জন্য ঝোপের ভেতর দিয়ে অন্য একটা পথে শ্মশানের দিকে এগোতে থাকে সে। শ্মশানের কাছাকাছি পৌঁছে আড়াল থেকে দেখতে পায় সুন্দরী, ঝুপ্ড়া অশ্বত্থ গাছটার নিচে বসে বসে, নদীর দিকে চেয়ে চেয়ে কি যেন ভাবছে নন্দ। এমনি খেয়াল খুসীতে এসে বসেছে তা ঘুণাক্ষরেও ভাবতে পারে না সুন্দরী? মতলব ছাড়া, কাজছাড়া এখানে এসে এমন চুপ-চাপ বসে থাকবে কেন?

সুন্দরী আরও কিছুক্ষণ আড়ালে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে লক্ষ করে নন্দকে? না, আর কারো তো খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না আশে পাশে? নন্দ বসে বসেই একটু ছটফট করছে বটে, কিন্তু একবারও এপাশে ওপাশে দৃষ্টি ফেলে কাউকে খুঁজে খুঁজে বেড়াচ্ছে না তো তার চোখ? তবে?

সুন্দরী আড়াল থেকে বেরিয়ে আসে, বলে—এই যে গায়েন, কার জন্য বসে আছ। বিন্দী না হরিমতী, না বিলাসপুরী মাগি-গুলোর জন্যে।

নন্দ চমকে উঠে ফিরে চায়। তার কণ্ঠস্বরে যেন একটা আশ্চর্য খুসীর সুরই বের হয়। বলে—সুন্দরী! তুমি।

—আর কেঁউ আসবে বলে ঠিক-ঠাক ছিল নাকি গায়েন?

নন্দ যেন হঠাৎ একটুখানি দকচে যায়।

সুন্দরী তার সেই স্বভাবগত জিবের বিষ নিয়ে নাড়াচাড়া করতে থাকে, বলে -আমি এসে মজাটা নষ্ট করে দিলাম, না গায়েন? তা কতদিন এই ঝোপ ঝাড়ের রঙ্গ-রস করছ। আমি ভাবি ধম্মপুত্তর যুধিষ্ঠির।

-সুন্দরী, যা তা বলছ কেন? আমার এসব ভাল লাগে না শুনতে।

—আহারে আমার কি সাধু বাবা এলেনরে।—সুন্দরীর কথা লক্‌লকে আগুনের জিব হয়ে নন্দকে ছ্যাঁকা মারে।—যার রোজ-গারের ক্ষমতা নেই, সাহস করে কোন কথা বলার মুরোদ নেই, তার আবার অত নাকড়াই কেন?

এই রোজগারের কথাই নন্দ বসে বসে ভাবছিল আর কি ভয়ানক একটা অস্বস্তিতে ছটফট করছিল। আজই সেইদিন। নন্দর প্রথম দিন! কানাই বলে বলে সব বুঝিয়ে দিয়েছে তাকে। রাত ঠিক সাড়ে নয়টায় রেল ইয়ার্ডের পেছনের জঙ্গলে বড় ছাতিম গাছটার নিচে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে তাকে। তারপর সব বুঝতে পারবে নন্দ। নন্দ আগে টাকা চায় তো তাই দেওয়া হবে তাকে। পাঁচ! পাঁচ শ' টাকা! নন্দ সেই খুসী আর অনিশ্চিত আশংখাতেই বুঝি ছট-ফট করছিল।

নন্দ বেশ ভারিক্কি চালে বলে—অত হেলাফেলা করো না। টাকাতো হাতের ময়লা। ইচ্ছা করলেই রোজগার করতে পারি অনেক?

—ছাই পারো। মুরোদ নেই এক পয়সার?

—কাল সকালেই দেখতে পাবে।

—আজ রাতে কোথাও ডাকাতী করবে বুঝি গায়েন ?

নন্দ প্রথমটা একটু থতমত খেয়ে যায়। ডাকাতীর সঙ্গে তার রাত্রির কাজটার কোন সম্পর্ক আছে নাকি ? ভঁয়ে বুকটা কেমন যেন বারকয়েক কেঁপে ওঠে নন্দর।

—যাই করি, তোমার তাতে কি ?

—মরি ! মরি ! আমার নাগরের কিছু হলে আমার কিছু নয়ত কার কি ?

—আমার মত তোমার তো আরও দশটা নাগর আছে।

সুন্দরী খিল খিল করে হেসে ওঠে। সেই হাসির দমকে তার পুরুষ্টু সুডৌল বুক দুটি দুলে দুলে ওঠে। আচমকা নন্দর চোখে ছলাৎ করে এক ঝলক রক্ত উঠে আসে।

—তারা তো তোমার মত গোবর গনেশ নয় ?

নন্দ রেগে বলে ওঠে—আমি গোবর গনেশ। আর কানাই, অটল বুঝি কেষ্ট ঠাকুর তোমার।

সুন্দরী আবার খিলখিলিয়ে শরীর নাঁচিয়ে নাঁচিয়ে হেসে ওঠে। যেন খুব একটা মজা পেয়েছে। লোকটাকে যে এমন ভাবে রাগানো যায়, লোকটা যে এত শিশুর মত সরল সেই ভেবে যত আমোদ পায় ; ভালো লাগে, তত যেন হাসি ও মুচড়ে মুচড়ে ওঠে পেটের ভেতর। সুন্দরী কখনো কখনো মুখে আঁচল চাঁপা দিয়ে ; কখনো এদিকে ওদিকে মুখ ঘুরিয়ে কেবল হাসতেই থাকে।

কিন্তু সুন্দরীর সেই তরঙ্গায়িত দেহের লাস্যময়তা নন্দর চোখে যেন আগুন ধরিয়ে দেয়। এক পলকে তা ছড়িয়ে যায় সমস্ত দেহে। কি তাপ আর গতি তার !' নন্দ বুঝতে পারে তার বুকের ভেতরটা একটা জান্তব আবেগে অন্ধকার হয়ে গেছে। তার বুকে একটা মানুষের কণ্ঠ যেন বোকা বোকা বলে চীৎকার করছে শুধু, একটা বাসনা মুখর ঝড় সমস্ত বাধা নিষেধ, সমস্ত ভ্রূকুটি, সমস্ত লজ্জা ভেঙ্গে চুঁড়ে সুন্দরীর উপর ঝাঁপিয়ে পড়তে চাইছে। নন্দর হাত-পা

কাঁপছে, বুক কাঁপছে, সমস্ত রক্ত আছারি-পিছারি খাচ্ছে ? নন্দ কি করবে কি না করবে কিছুই ভেবে পায় না কয়েক মুহূর্ত।

হঠাৎ নন্দর দিকে চোখ পড়তেই হাসি থেমে যায় সুন্দরীর তার চোখে মুখে ভয় আর শংকা চিত্রিত হয়ে ওঠে। সমস্ত শরীর যেন ঝড়ের সংকেত পেয়ে গুড় গুড় করে কেঁপে ওঠে। এক মুহূর্ত মাত্র! তার পরই সুন্দরী পেছন ফিরে ছুট্‌তে আরম্ভ করে ডেরার দিকে। কিন্তু কেন যে সে নদীর পারের সোজা পথে না গিয়ে, সেদিনের সেই লতাপাতা ছাওয়া ডুমুরের ঝোপটার ভেতর দিয়ে ছোটে তার কিছুই সে বোঝে না।

নন্দর ভেতরের সেই জন্তুটা যেন হঠাৎ শক্ত একটা নাড়া খেয়ে সুন্দরীর পেছনে রক্ত লুলোপের মত ছুটে যায়। একটা হাত বাড়িয়ে খপ্‌ করে সুন্দরীর একটা হাত চেপে ধরে। ওরা তখন সেই নির্জন ঝোপটার ভেতরই প্রায় এসে পড়েছে। চারিদিকে উঁচু নিবিড় জঙ্গল তাদের সমস্ত কিছু থেকে আলাদা করে নেয়।

—না, না, আমাকে ছেড়ে দাও গায়েন ?

নন্দ কি একটা কথা বলতে চাইল কিন্তু আবেগে আশ্লেষে উত্তেজনায় তার কোন কথাই স্পষ্ট করে জিব থেকে বের হল না। শুকনো গলায় এসে খট্‌ করে আট্‌কে গেল।

—আমাকে ছেড়ে দাও, আমার ভয় করছে।

—উঁহুঃ—একটা জন্তুর মত নাকে শব্দ করে সুন্দরীকে আরও যেন কাছে টেনে আনতে চায় নন্দ।

—গায়েন, তোমার পায়ে পড়ি আমাকে ছেড়ে দাও।—সুন্দরীর শরীরে কোন প্রতিরোধ শক্তিই বুঝি আর নেই। ক্রমশই যেন সে মাদকাচ্ছন্ন হয়ে আসছে, তার সারদিনের ক্লান্তি যেন আরও অবশ করে ফেলছে তাকে।

—গায়েন আমি মরে যাব।

—সুন্দরী !

—না, না গায়েন, পায়ে পড়ি তোমার।

—একবার! সুন্দরী বলো, একবার বলো।

সুন্দরী যেন সমস্ত শক্তি একত্রিত করে শেষবারের মত একটা শেষ প্রতিরোধ দিতে চেয়ে নন্দকে একটা ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিতে চায়। নন্দর হাত কাঁপছিল, হঠাৎ আল্‌গা হয়ে যেতে সুন্দরী টাল শামলাতে না পেরে খানিকটা পেছনে ছিটকে বসে পড়ে। শরীরের পেছন দিকে হাত মেলে দিয়ে দেহটাকে আঘাত থেকে বাঁচাতে যেতেই স্বাস্থ্যোজ্জ্বল বুকের টান্ টান্ জামাটার বোতামগুলো ছড়াৎ করে খুলে গিয়ে নগ্ন বুক দুটি বাচ্চা খরগোশের মত লাফ দিয়ে বেরিয়ে আসে।

নন্দর মাথার ভেতর গণ্ডগোল হয়ে যায়। সে সুন্দরীর পাশেই বসে পড়ে প্রায় ঝাপ্‌সা চোখেই দু'হাত বাড়িয়ে সুন্দরীর সরু কোমরটা জরিয়ে ধরবার চেষ্টা করে বোধ করি।

সুন্দরী শিথিল অবসন্ন কণ্ঠে বলে—গায়েন, আমি আজ সারাদিন খাইনি। আমার শরীর ভাল নেই। আমি মরে যাব তাহলে।

সুন্দরীর গলার স্বরে কি ছিল কে জানে, নন্দর উৎকট পাশবিক ইচ্ছাটা যেন শক্ত একটা চাবুক খেয়ে স্থির চোখে চেয়ে থাকে তার দিকে। তার ভেতরের সরল ভাল মানুষ লোকটা যেন একটা মেয়ের করুণ মিনতির কাছে হার স্বীকার করে একেবারে পঙ্গু হয়ে গেছে। নিজের জান্তব ইচ্ছাটার জন্যই যেন নিজের কাছে লজ্জা করছে এখন। কিন্তু অসহ্য! অসহ্য সুন্দরীর দিকে চেয়ে বসে থাকা? নন্দ কি করবে ভেবে না পেয়ে হঠাৎ দু'হাত দিয়ে চোখ ঢাকে আর সমস্ত উদ্বেল ইচ্ছাটাকে গলা টিপে টিপে হত্যা করতে চাইল।

তখন সন্ধ্যা আরও গাঢ় হয়ে এসেছে। সুন্দরী দ্রুত নিজেকে ঠিক করে নিয়ে উঠতে যেতেই দেখতে পায় নন্দর সমস্ত শরীর যেন শীতার্তের মত কাঁপছে। সমস্ত শক্তি দিয়ে যেন সে কিছু একটা ইচ্ছাকে চেপে চেপে রাখতে চাইছে।

—সুন্দরী! তুমি চলে যাও। আমার মাথার শিরা ছিঁড়ে যাচ্ছে। পালিয়ে যাও তুমি তাড়াতাড়ি!

সুন্দরী উঠতে গিয়েছিল কিন্তু উঠল না। সুন্দরীর কি কোন কথা মনে পড়ল? কোন ছবি কি তার চোখের সামনে ভেসে উঠল হঠাৎ? না, এই ভাল মানুষ লোকটাব জন্য তার নিজের শরীরের কষ্ট ও আর কষ্ট বলে মনে হল না। না আর কিছু? এত কালের অনাস্বাদিত সেই নিত্য আকাংখিত সুখের লোভই কি তাকে উঠতে দিল না?

—গায়েন!

—তুমি চলে যাও সুন্দরী। নন্দর কণ্ঠে যেন মিনতি?

—আমার দিকে ফের গায়েন। চোখ চাও।

নন্দ হাত সরিয়ে নিয়ে ফিরে চায়। তার শংকিত দেহ আবার কামনা জর্জর হয়ে উঠতে থাকে চোখের পলকে। সুন্দরী স্নেহে, মমতায় অকস্মাৎ দুই হাটুর উপর ভর দিয়ে একটু ঝুকে পড়ে নন্দর মুখটা টেনে এনে গভীর আবেশে তার বুকের উপর চেপে ধরে। নন্দ যেন পাগল হয়ে যায়। তার কম্পিত হাত দুটি সুন্দরীর শরীরকে ঘিরে ব্যস্ত হয়ে ওঠে, নির্দয় হয়ে ওঠে।

রাত গভীর হয়ে আসে। রাত বাড়ে। কিন্তু দীর্ঘদিনের পরস্পরের জন্য বুভুক্ষিত দুটি নারী পুরুষ তাদের আদিমতম কামনা বাসনা থেকে মুক্তি নিয়ে যেন বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতে পারে না।

—গায়েন আমার কষ্ট হচ্ছে।

নন্দ চুপ।

—গায়েন।

এবার নন্দ সাড়া দেয়—কি?

—আমি আর পারছিনা গায়েন। আমি বোধ হয় হাটতে ও পারব না এক পা।'

রাত আরও নিশুতি হয়ে আসে ধীরে ধীরে। অন্ধকার

আকাশের নিচে আরও অন্ধকার ঘাসে শুয়ে শুয়ে দুটি মানব মানবী পরস্পরের দিকে চেয়ে কথা বলে, হাসে। যেন ভুলে গেছে ওরা কোথাকার মানুষ। ওদের কেউ আছে। ওদের কোথাও ফিরে যেতে হবে এক সময়?

হঠাৎ এই সময় দূর রেল ইয়ার্ডের দিক থেকে পাঁচ ছয়টি বন্দুকের শব্দ কানে এসে বাজে ওদের। ওরা চমকিত হয়ে উঠে বসে, তৈরী হয়ে উঠে দাঁড়ায়। সুন্দরী বন-বিড়ালীর মতই ঝোপ থেকে বেরিয়ে চোখের পলকে অন্ধকারে কোথায় যেন হারিয়ে যায়। ভরা বুকে প্রফুল্লচিত্তে আস্তানার দিকে এগোতে এগোতে নন্দর মনে পড়ে যায়, আজ তার সাড়ে নয়টায় ছাতিম গাছটার নিচে দাঁড়াবার কথা ছিল? কয়টা বাজে এখন? ইস্ কি ভুল?

নন্দ দ্রুত আস্তানার দিকে পা চালায়।

কাঁক ডাকা ভোরেই খবরটা সকলের কানে পৌঁছে যায়।

কেউ কেউ চমকে ওঠে। কেউ কেউ যেন জানতই ব্যাপারট একদিন এমন একটা ঘটনা হয়ে উঠবে। কেউ স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে ভাবে. যাক্ আপদ গেছে। বাঁচা গেল। ওগুলো ছিল যেন গলার কাঁটা।

উপেন শুনে বলে—আমি তো জানতামই একদিন এমন ন হয়ে পারে না। আমার শালা পা'টাই গেল এই করে। বুঝলে গায়েন, বার বার বলেছি, খেটে খা'। সুখ না থাকুক, স্বস্তি থাকবে। এবার বোঝ কত ধানে কত চিঁড়ে।

শুধু নন্দর মুখে কোন সাড়া শব্দ নেই; স্তব্ধ হয়ে বসে থাকে সে। কানাই ভুলে, অটল আরো দু'জন কাল রাতে রেলইয়ার্ডে ওয়াগন ভেঙ্গে মাল পাচার করতে গিয়েছিল। এর আগে অনেক-বারই নাকি ওরা নির্বিঘ্নে কাজ সেরে ফিরে এসেছে। এবারের দাঁওটা ছিল বেশ বড়। কিন্তু কাল রাতে রেলপুলিশের কোন একটি

নীতিবাদী আর কর্তব্যপ্রাণ প্রহরী নাকি সঙ্গীদের কথা উপেক্ষা করেই গুলি ছুড়েছে আর হাতে-নাতে ধরে ফেলেছে একটাকে। কানাই ছুলে পালাতে চেয়েছিল, গুলি খেয়ে তখনই মারা পড়েছে। অটল ধরা পড়েছে।

সবচেয়ে আশ্চর্য্য আর অবিশ্বাস্য কথটা ওরা অবাক হয়ে শোনে। সর্ব্বজন শ্রদ্ধেয় সমাজসেবী সত্যপ্রিয় চৌধুরীকে পুলিশ ভোর রাতেই গ্রেপ্তার করেছে। চৌধুরীই নাকি ছিল এদের দলের পাণ্ডা। চোরাই মালের সে-ই নাকি ব্যবস্থা করত আর মোটা মুনাফা নিজের পকেটে পুরত।

নন্দর কপালে ঘাম জমে থক্ থক্ করে। মনে হয় সুন্দরীই তাকে বাঁচিয়েছে কাল। নয়ত ভগবানই সুন্দরীকে পাঠিয়েছিল সেই নদীব ধারে আর তার রক্তের ভেতর উৎকট পশুটাকে খুঁচিয়ে তুলেছিল। এ না হলে আজ এখন নন্দ কোথায় থাকত? তার মৃত দেহটাকে লাথি মারতে মারতে লোকে বলত—বেটা ভড়ংবাজ। তলে তলে নষ্টামী দেখো।

নন্দ কোন কথাই কারো কাছে আর প্রকাশ করে না। চুপচাপ যেমন ছিল তাই থাকতে চেষ্টা করে। মাঝে মাঝে শুধু সেই লোভী মনটাকে টুঁটি চেপে ধরে সায়েস্তা করতে চায়, নখ দিয়ে লোভটার চোখ গেলে দিতে চেষ্টা করে।

কিন্তু পরদিন যে খবরটা ওরা শুনতে পায়—সেটা শুনে সমস্ত মাঠের মানুষগুলোর মাথায় যেন আকাশ ভেঙ্গে পড়ে। মুখ পাংশু হয়ে ওঠে। চোখে চোখে বোবা দৃষ্টি এর তার চোখে সাহস আর সান্ত্বনা যেন খুঁজে ফিরতে থাকে। এতবড় একটা বিপদ; এতকাল পর হঠাৎ এমনি ভাবে এসে উপস্থিত হবে কেউ ভাবতে পারেনি তা। চিরকালের আশ্রয়হীন মানুষগুলো আবার নিরাশ্রয় হবার আশংকায় চারিদিকে শুধু অন্ধকার দেখে। কোথায় যাবে ওরা এতকালের এই আশ্রয়ের মায়া ছেড়ে? কোথায় স্থান পাবে,

কোথায় পাবে বাসস্থান ? ওদের জন্য কি পৃথিবীতে কোথাও এতটুকু মায়া অবশিষ্ট আছে ? ওরা ভাবে, হায় ! হায়, আমরা পাপী, মহাপাপী।

মাষ্টার বাবুর বাড়ীতে কাজ করতেই করতেই রেল কোম্পানীর হুকুমনামাটা শুনতে পায় সুন্দরী। তার বুকটা কেন জানি ছাঁৎ করে ওঠে কি একটা অজানিত ভয়ে। সেখান থেকে সোজা ছুটে আসে উপেনের ডেরাতে সে। উপেন বেরিয়েছিল তার রুজির ধান্দায়, নন্দ গালে হাত দিয়ে বসে বসে ভাবছিল।

—গায়েন কি হবে তাহলে ? সুন্দরীর গলার শংকাতুরতা কান্নার মত।

নন্দ দেখতে পায় সুন্দরীর মুখে একটা পশুর অত্যাচারের চিহ্ন এখনো একবারে মিলিয়ে যায়নি ? কিন্তু তার শরীরটা কি খুসী খুসী ভরা ভরা মনে হচ্ছিল।

—ভয় পাচ্ছ নাকি ? ভয়ের কি আছে।

—না গায়েন, আমার বুক কাঁপছে। আমি কি করব ? তুমি ! তুমি তো……তুমি তো যখন খুসী, যেদিকে খুসী চলে যেতে পার।
—বলতে বলতে সুন্দরী কেঁদে ফেলে।

নন্দ বিব্রত বোধ করে। কিন্তু একটা সুখ এসে যেন তার মনের গায়ে নরম মিষ্টি হাত বুলিয়ে দেয়। বলে--আরে ! আরে কাঁদ কেন ? তোমাকে ফেলে যাব নাকি ? আমি বুঝি মানুষ নই।

সুন্দরীর মুখে হাসি ফুটে ওঠে। দরজাটার কাছ থেকে সুন্দরী এবার নন্দর আরও কাছে সরে আসে একটা লোভের মত। নন্দ বুঝি প্রলোভিত হয়ে ওঠে। সে সুন্দরীকে রাশি রাশি মমতায়, মাদকতায় কাছে টেনে এনে দিনের আলোতে ওকে খুটিয়ে খুটিয়ে দেখতে দেখতে ধীরে ধীরে ওর সঙ্গে একসময় মিশে যায়। সুন্দরী হাসে খুসী হয়, তার সোহাগের মন লজ্জা ভুলে যায়, সংকোচ ভুলে যায়। নন্দ তার মরদ হবে, তার জীবনের প্রথম পুরুষ, সুখের, এবং যন্ত্রনার এক বিচিত্র

অনুভব প্রথম তার শরীরে ছড়িয়ে দিয়েছে সে? নন্দর কাছে রাত্রিই বা কি দিনই বা কি? শুধু মনে হয় একটা মানুষ পেয়েছে সে। ভালবার একটা মানুষ। যে মানুষ পেলে দিন রাত্রি এক হয়ে যায়, যে মানুষ পেলে দিনেমানেও ভয়ংকর সূর্য্য স্নিগ্ধ কথা বলে; রাত্রির বীভৎস অন্ধকারও আলো জেলে রাখে।

পরদিন সকাল থেকেই পোটলা-পুটলী বেঁধে একজন দু'জন করে ছিন্নমূল নিরুপায় মানুষের দল আবার নূতন একটা আশ্রয়ের সন্ধানে বেরিয়ে পড়তে থাকে। ওদের মুখ কালো, ওদের গতি মন্থর, ওদের ভবিষ্যৎ অন্ধকারের আরও কোন গভীর অতলে কিনা কেউ জানে না ওরা। যত খারাপ হউক, যত স্ব-স্ব প্রধান হউক, তবু বোধ হয় একটা সমাজ মন ছিল ওদের, ওদের অজ্ঞাতেই একটা বাধন ছিল। তাই কেউ চোখের জল ফেলে, কেউ ম্লান হেসে, কেউ রেল কোম্পানীকে, কেউ কেউ কানাই দুলেকে শাপ শাপান্ত করে বিদায় নেয়।

—চলি শশী ভাই। এই সহরেই তো থাকবে। দেখা হবে।

—আর কোথায় যাব। এখানেই মরব। এখানেই মাটির রস হব!

—সুখনজী কিধার জায়গা।

—রামজী জানেন ভেঁইয়া। যেখানে লিবে সেই খানেই যাবো।

—গায়েন, সহর ছেড়ে যাবে নাকি? যাবে না! বেশ বেশ?

—উপীন, তুমি কোথায় যাবে গো।

—ওই তো পূবের বস্তিতে। সুন্দরী আর নন্দ থাকবে সঙ্গে।

—আহা! মেয়েটা ভাল ছিল গো। ভালই হলো।

উপেন খুসীর কণ্ঠে বলে—ওদের ছেলে পুলে হলে আমি হব ওদের জেঠা। আমি ওদের দেখা-শোনা করব, ওদের সঙ্গে খেলব; হাসব, গল্প করব। আবর্জনা হয়ে অন্ধকারে পড়ে আছি, ভদ্দর

লোকরা তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করছে করুক। কিন্তু ভাই আমাদের সুখ, দুঃখ তো আর কেড়ে নিতে পারবে না? তবে?

তারপর বিকাল আসে। নোংরা দুর্ভাগ্য পীড়িত, বাসের অযোগ্য পশুর খোয়ারের মত ঘরগুলো সন্ধ্যার আগেই ধ্বংশস্তুপ হয়ে ওঠে। ছন্নছাড়া কুকুর কয়েকটা ঘেউ ঘেউ করে কেন ডাকল কে জানে। দুটো বিড়াল মিউ মিউ করে সারা রাত কেঁদে কেঁদে সমস্ত মাঠময় ঘুরে ঘুরে বেড়াল।

শুধু একটা মানুষ অন্ধকার জানালায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অনেক গভীর রাত পর্য্যন্ত এই মাঠের ধ্বংশস্তুপের দিকে চেয়ে চেয়ে দেখে আর ভাবে —পৃথিবীতে চিরকাল কি শোষক শোষিত, ধনী, দরিদ্র, বড়লোক ছোটলোক এই বিবেকহীন বিভেদ বুদ্ধির জগদ্দল পাথরের চাঁপে মুমূর্ষু হয়ে থাকবে? চিরকাল কি শোষিতের বুকের রক্তে স্বর্গ সিড়ি তৈরী করে স্বর্গ লোভী শোষকেরদল মানুষের স্বর্গে উঠতে থাকবে। আর বঞ্চিতের দল নিরন্ন হাহাকারে চারিপাশ হাতরে হাতরে মরবে মাটিতে একটু খানি পা রেখে দাঁড়াবার জন্য? এই কথাই কি বুঝতে হবে ওরা মানুষ নয়, ওরা স্বর্গ সিঁড়ি তৈরীর যন্ত্র মাত্র। ওদের বাঁচার প্রশ্ন অবান্তর কারণ ওরা মরতেই আসে। ওরা অবাঞ্ছিত, ওরা দুর্ভার, ওরা আবর্জনা। ওদের সুখ দুঃখ নেই, ওদের আশা আনন্দ নেই। ওরা অর্থহীন। তাই কি? এই কি সত্য? এই কি চিরকালের নিয়ম?

দূর থেকে ও শোনা যায় অন্ধকার ধ্বংশস্তুপে বিড়াল দুটি ঘুরে ঘুরে কাঁদছে আর কাঁদছে। সেই কান্না উর্ধে নীলিম শান্তির মহাকাশে হাত বাড়িয়ে বাড়িয়ে ও পত্রআচ্ছাদিত বৃক্ষশাখায় প্রতিহত হয়ে ফিরে আসে একসময়। এই পৃথিবী বুঝি এমনি করে এক কান্নার ধ্বংসস্তুপ হয়ে উঠছে দিনের পর দিন।

—